এই সংখ্যায় আছে

- ★ মহান নভেম্বর বিপ্লব
- ★ শান্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে নেহরু সরকারের বৈদেশিক নীতি
- ★ নয়াচীনের গঠনতন্ত্র প্রসঙ্গে
- ★ ভারত সরকারের শ্রমনীতি
- ★ সুন্দরবনের গৌরবোজ্জ্বল ভাগচাষ আন্দোলন ও বিভিন্ন গণআন্দোলনের সংবাদ

নভেম্বর বিপ্লব বিশেষ সংখ্যা

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী এম,এল,এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

৭ম বর্ষ : বিশেষ সংখ্যা—১] ● ৮ই নভেম্বর, সোমবার '৫৪ ● [চার আনা

মহান নভেম্বর বিপ্লব !

নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ। আজ হতে ৩৭ বছর আগে রাশিয়ার শ্রমিক ও চাষী মিলিতভাবে তথাকার ধনিক ও সামন্ত প্রভুদের উচ্ছেদ করে সেখানে শোষিত মেহনতী মানুষের রাষ্ট্র কায়েম করে। এদিন বিশ্বের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র-বিপ্লব এর আগেও সংঘটিত হয়েছে কিন্তু তার কোনটিই শোষিত মানুষের প্রকৃত মুক্তি এনে দেয়নি—এক শোষণ গিয়েছে, অন্য জাতের শোষণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একমাত্র এই নভেম্বর বিপ্লবই, সর্ব্বপ্রথমে শোষিত জনসাধারণকে সমস্ত রকম শোষণের বন্ধন হতে মুক্ত করে বাধাহীন অগ্রগতির পথ খুলে দিয়েছে।

শুধু যে এই বিপ্লব রাশিয়ার শোষিত মানুষকে মুক্তি দিয়েছে তা নয়; উপনিবেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামকে তা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারে জর্জরিত উপনিবেশগুলির জনসাধারণ নভেম্বর বিপ্লবের মধ্যে আশার আলো দেখেছে, তাদের মুক্তি পথের নির্দেশ পেয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রে তাদের প্রকৃত কার্য্যকরী সহায়ক শক্তির সন্ধান পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে ফাটল ধরিয়ে নভেম্বর বিপ্লব পুঁজিবাদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করেছে। তাই নভেম্বর বিপ্লবের স্বীকৃতি—আন্তর্জাতিক। সেই কারণেই উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ ও পেছিয়ে পড়া দেশগুলির জনসাধারণ নভেম্বর বিপ্লবকে অভিনন্দন জানায়।

যে বীজ ১৯১৭ সালে উপ্ত হয়েছিল, আজ তা শাখা প্রশাখা মেলে পৃথিবীর বিরাট অংশে ছায়া দান করছে। সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের নিগড় ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে পূর্ব্ব জার্ম্মাণী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া; এশিয়ার অর্দ্ধেক মানুষ সমস্ত শৃঙ্খলকে চূর্ণ করে শোষণহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে—নয়া চীন, উত্তর কোরিয়া ও ভিয়েৎমিনে। সারা দুনিয়া আজ মুক্তির আশায় ভরপুর—মুক্ত আন্দোলনের সম্ভাবনায় পূর্ণ। নভেম্বর বিপ্লবে যে পথের শুরু সে পথ আজ বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে। আজ একা সোভিয়েট নয়। সারা বিশ্ব দুই শিবির, দুই বাজারে বিভক্ত। শান্তি ও সমাজতন্ত্রের শিবির ক্রমোন্নতির পথে ধাপে ধাপে এগুচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী যুদ্ধ শিবির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সঙ্কটের ধাক্কায় দিন দিন দুর্ব্বল হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক বাজারের উপস্থিতি ধনতান্ত্রিক বাজারের শেষ দিনকে নিকটতর করেছে। এই সবই নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার দান।

দিন যত ঘনিয়ে আসে অত্যাচারীর অত্যাচার, বলদর্পীর দম্ভ, শোষকের শোষণ ততই চূড়ান্ত রূপ নিতে চায়। তীব্রতর অত্যাচার ও শোষণের মাধ্যমে বাঁচতে চায় প্রতিক্রিয়া। দিকে দিকে আগুন জ্বালতে চায় সে যুদ্ধের; জনতার আন্দোলনকে সে গুলির মুখে ধ্বংস করতে চায়; ধ্বংসের মধ্যে সে তার অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটাবার পথ খোঁজে। বার বার ইতিহাস প্রমাণ করেছে—এ চেষ্টা বাতুলতা। গণশক্তিকে সন্ত্রাসের আঘাতে ধ্বংস করা যায় না। জয় তার অবশ্যম্ভাবী। ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধবাদী জোট [illegible] পরাজিত হয়ে [illegible] হয়েছে দিয়েন বিয়েন ফু'তে। তবুও তার যুদ্ধ পিপাসা মেটেনি—মিটতে পারে না। সারা দুনিয়ায় যুদ্ধজোট তৈরী করে চলেছে; ইউরোপে, উত্তর অতলাণ্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেসন (NATO) ইউরোপিয়ান ডিফেন্স কম্যুনিটি (EDC) লণ্ডন চুক্তি, পশ্চিম জার্ম্মাণীর সামরীকরণ, এশিয়ায় অ্যাঞ্জাস (ANZUS) সিয়াটো, (SEATO) ও সিয়াডো (SEADO) মধ্যপ্রাচ্যে মেডো (MEDO) তার নিদর্শন। কিন্তু এ এক দিক। বিরুদ্ধদিকে শান্তির শক্তি দ্রুততর ও ব্যাপকতরভাবে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। অমর কোরিয়া, অজেয় দিয়েন বিয়েন ফু' প্রমাণ করেছে লক্ষ লক্ষ কামান, বন্দুক, গোলা-গুলি, ঝাঁক ঝাঁক বোমারু বিমান, জাহাজ বোঝাই ডলার মুক্তির শক্তিকে, শান্তির শক্তিকে পরাজিত করতে পারেনা বরং প্রতিক্রিয়া মুক্ত সেনার হাতে ধ্বংস হতে বাধ্য। শুধু প্রয়োজন—সতর্ক সজাগতা, সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধতা, সংহত সাংগঠনিকতা। তা আমাদের অর্জ্জন করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে, ব্যাপ্ত করতে হবে—নভেম্বর বিপ্লবের আজকের দিনে এই হ'ল নির্দেশ।

ভারতের মাটিতে জনতার দীর্ঘদিনের সাধনা আজও রূপ নেয়নি। শোষণের অক্টোপাশে ক্ষত বিক্ষত মানুষ মুক্তির জন্য দিন গুনছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আওতায় সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র আজও জনতার বুকে তার নখর গেড়ে রেখেছে। এ রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রেখে জনতার মুক্তি মিলবে না। প্রকৃত স্বাধীন, শোষণহীন, সুখী সমাজ গড়তে হলে চাই পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, সামন্ততান্ত্রিক আর সমস্ত রকম শোষণের অবসান, এই সমস্ত শোষণ অটুট রাখার অস্ত্র, ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে চাই প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দল—ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার সে দল। বড় দল, প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দল না হলে তা দিয়ে জনতা মুক্তি আনতে পারেনা—তাই সর্ব্বপ্রযত্নে জনতার আজকের কর্ত্তব্য সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারকে সমর্থন করে তার শক্তি বৃদ্ধি করা।

বিপ্লবের প্রধান শক্তি, শ্রমিক শ্রেণী। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী আজ দ্বিধা বিভক্ত। বিরাট অংশ তার আজও ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বের আওতায় চলে। শ্রমিক শ্রেণীকে এ ভ্রান্তি দূর করতে হবে। নিজেদের মধ্যে সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধতা গড়ে তুলে, কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্তের সাথে মিলিত হয়ে দেশব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। পাল্টা সরকার গঠনের আওয়াজ—পার্লামেন্টারী মোহ সৃষ্টির আওয়াজ। নভেম্বর বিপ্লব এই শিক্ষা দেয়—পাল্টা সরকার নয়, ধনিক রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ও মেহনতী মানুষের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই মুক্তির উপায়। সেই রাষ্ট্র উচ্ছেদের লড়াই-এর প্রস্তুতি হিসেবে শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, চাষীর জমির লড়াই, নিম্ন মধ্যবিত্তের ছাঁটাই ও বেকার-বিরোধী সংগ্রাম তথা শোষিত মানবের গণতান্ত্রিক দাবী আদায়ের লড়াই পরিচালিত করতে হবে। এই লড়াই এর মাধ্যমে শোষিত শ্রেণীকে চিনে নিতে সাহায্য করতে হবে তার প্রকৃত দল, বিচ্ছিন্ন করতে হবে সংস্কারবাদী সুবিধাবাদী নেতৃত্বকে জনমন হতে, গঠিত করতে হবে জনতার সংগ্রামের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। এই পথে নভেম্বর বিপ্লব সফলতা লাভ করেছিল। এ পথ সারা বিশ্বের শোষিত মানবের মুক্তির পথ। এ পথ নিরন্ন, দুঃস্থ ভারতবাসীর সুখী, শোষণহীন, সমৃদ্ধ জীবন লাভের উপায়। জীবনপণ করে সেই পথে নিজের স্বার্থে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে অগ্রসর হতে হবে। নভেম্বর বিপ্লবের এই হ'ল পথ নির্দেশ। **ইনকিলাব জিন্দাবাদ।**

সম্পাদক- প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক ২৩, ডিকসন্ লেন পারবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কালকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

সমাজতন্ত্রের পথে নয়াচীনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ

[নয়াচীনের জাতীয় গণ কংগ্রেস গত ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪, চীন গণ-রিপাব্লিকের গঠনতন্ত্র গ্রহণ করে। সমগ্র দেশবাসী অভুতপুর্ব উদ্দীপনার সহিত দুই মাসাধিককাল খসড়া গঠনতন্ত্র লইয়া আলাপ আলোচনা ও বিচার করিয়া অতঃপর তাহাদের দেশের গঠনতন্ত্রকে কার্য্যকরীভাবে গ্রহণ করিয়াছে। মুক্ত নয়াগণতান্ত্রিক চীনের এই গঠনতন্ত্র মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা এবং চীন ও সারা পৃথিবীর সাম্যবাদী আন্দোলনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত। ইহা শুধু মহান চীন জাতির সুদীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের আশা-আকাংখাকে বাস্তবে রূপায়িত করিল তাহাই নহে; ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা আগাগোড়া রচিত হইয়াছে সর্বতোভাবে চীনা জাতিকে বর্তমান নয়াগণতান্ত্রিক স্তর হইতে সমাজতন্ত্র রচনার পথে পরিচালিত করা!

জাতীয় গণ-কংগ্রেসের নিকট খসড়া গঠনতন্ত্র সম্পর্কে কমরেড **লিউ শাও চি** যে রিপোর্ট পেশ করেন তাহা হইতে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় এখানে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল। স্থান সংকুলানের প্রতি নজর রাখিয়া দু'একটি অংশকে ঈষৎ সংক্ষেপ করিতে হইয়াছে।—সম্পাদক]

২য় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২ ঃ সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরের অধ্যায়ে রাষ্ট্রের কর্মপন্থা।

চীনের খসড়া গঠণতন্ত্রের ৪র্থ ধারা অনুযায়ী: "চীন গণ-রিপাব্লিক রাষ্ট্র যন্ত্র ও সামাজিক শক্তি সমুহের উপর নির্ভর করিয়া এবং সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ণ ও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের মাধ্যমে সমুদয় শোষণ মুলক ব্যবস্থারই পর্য্যায়ক্রমে বিলুপ্তি সাধন একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনকে নিশ্চিত করিবে"।

এই নীতির পরিপূর্ণ রূপায়নের জন্য 'সাধারণ কর্মনীতি' শীর্ষক অধ্যায়ে বিভিন্ন ধারাতে অনেক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে (রিপোর্টের ১ম অধ্যায়—সঃ গঃ)। সেই ব্যবস্থাগুলি থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠণের সাধারণ লক্ষ্য এবং তার উদ্দেশ্যে গ্রহণীয় বাস্তব কর্মব্যবস্থায় এই জয়েরই ছবি পাওয়া যাবে।

আমাদের বর্ত্তমান রূপান্তর কাল-টুকুতে (Transition period) দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এখনও অনেকগুলো বিভিন্ন ধরনের অঞ্চলে (sector) বিভক্ত আছে। উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা মোটামুটি এই কয়েক রকমের ভাগে বিভক্ত : (১) রাষ্ট্রের মালিকত্ব, অর্থাৎ, সমস্ত দেশবাসী যার মালিক; (২) সমবায় মালিকত্ব, অর্থাৎ শ্রমজীবী জনতার যৌথ মালিকত্ব; (৩) ব্যক্তিগত শ্রমিকের মালিকত্ব; এবং (৪) পুঁজিবাদী মালিকত্ব। রাষ্ট্রের কর্তব্য হ'ল উপরোক্ত প্রথম দুইটি অংশকে শক্তিশালী করা ও বিকাশ লাভে সাহায্য করা অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক অংশকে এবং শেষের দুটির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন—অর্থাৎ অর্থনীতির অ-সোস্তালিষ্ট অংশকে। কাজে কাজেই রাষ্ট্র দৃঢ়ভাবে "রাষ্ট্রায়ত্ব অর্থনীতির বিকাশকে প্রথম স্থান দিয়েছে" এবং সমাজতন্ত্রের অর্থ-নৈতিক ভিত্তিস্বরূপ ভারী শিল্পের ক্রমিক গঠনলাভের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। সংগে সংগে রাষ্ট্র "সমবায় অর্থনীতিকেও উৎসাহ ও নেতৃত্ব জোগাচ্ছে এবং গড়ে উঠতে সাহায্য করছে", আর "পুঁজিবাদী মালিকানাকে হটিয়ে দিয়ে সেখানে সমগ্র জনগণের মালিকানা ক্রমশঃ কায়েম করে পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যকে বিভিন্ন ধরণের রাষ্ট্র-পুঁজি চালিত (State capitalist) অর্থ-নীতিতে রূপান্তর লাভে উৎসাহ ও নেতৃত্ব দিচ্ছে।"

খসড়া গঠণতন্ত্রে এই যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে এগুলো কল্পনার ওপর ভিত্তি করে রচনা করা হয়নি. চীন গণ-রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে সামাজিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিন্যাসে

From the U.S.S.R.

MARXIST BOOKS :

MARX—

	Rs.	As.	P.
Civil War in France	0	4	0
Class struggle in France	0	4	0
Critique of the Gotha Programme	0	3	0
Wage, Labour & Capital	0	3	0
Wages, Price & Profit	0	3	0

ENGELS—

	Rs.	As.	P.
Ludwig Feuerbach & the end of classical German Philosophy	0	3	0
The origin of the Family, Private Property & the state	0	8	0
The Housing Question	0	4	0
Socialism : Utopian & Scientific	0	3	0

LENIN—

	Rs.	As.	P.
Marx-Engels-Marxism	1	14	0
Materialism & Empirio Criticism	1	14	0
Imperialism, the highest stage of Capitalism	0	6	0
The State & Revolution	0	9	0
What is to be done ?	0	6	0

STALIN—

	Rs.	As.	P.
Stalin Works Vol 1 to 7 each	1	8	0
„ Vol 8 „	1	4	0
Economic Problems of Socialism in the USSR	0	4	0
Foundations of Leninism	0	6	0

ON PHILOSOPHY :

	Rs.	As.	P.
The Socio-Political & Philosophical views of N.A. Dabrolynbov	0	2	0
The Socio-Political Philosophical views of V. G. Belinsky	0	2	0
A. I. Herzen Great Russian Thinker & Revolutionary Democrat	0	4	0
N. G. Chernyshevsky's World outlook	0	3	0

ON SCIENCE :

	Rs.	As.	P.
The Origin of Cells	0	6	0
Soviet Science & Technique in the Service of building Communism in the USSR	0	6	0

SOVIET JOURNALS

	Yearly			Half-Yearly			Single Copy		
1. New Times (*Weekly*)	6	0	0	3	0	0	0	3	0
2. Soviet Literature (*Monthly*)	6	0	0	3	0	0	0	10	0
3. Soviet Union (*Monthly*)	6	12	0	3	6	0	0	13	0
5. News (*Fortnightly*)	4	8	0	2	4	0	0	4	0
4. Soviet Woman (*Monthly*)	4	4	0	2	2	0	0	8	0

CURRENT BOOK DISTRIBUTORS

3/2, MADAN STREET, CALCUTTA-13.

নয়াচীনের গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন দিক

যে সব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছে এবং জনসাধারণ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তার ভিত্তিতে। এই ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের কিছু আলোচনা করব।

প্রথম প্রশ্ন হ'চ্ছে এই রূপান্তরের (Transition) রূপ সম্পর্কে। আমরা জানি কৃষি, হস্ত-শিল্প ও পুঁজিবাদী শিল্প-বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ. এবং তা রাতারাতি করবার আশা করাই অন্যায়। জনতার অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক সচেতনতার ভিত্তিতে এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে সম্ভাব্যতার বিচার করেই আমাদের পদক্ষেপ করতে হবে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ পেয়েছি যে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর—তা কৃষি, হস্ত শিল্প বা পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্য যে ব্যাপারেই হোক না কেন—এই সন্ধিক্ষণে তার নিজস্ব একটি রূপ গ্রহণ করতে পারে এবং এটা খুবই প্রয়োজন যে আমাদের গৃহীত সন্ধিক্ষণ-কালীন রূপগুলো (Transitional Forms) যেন পরিবর্তন-সাপেক্ষ বিভিন্ন রকমের হয়।

কৃষি ও হস্তশিল্পের সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের এই রূপান্তর কালীন রূপ হবে প্রধানতঃ শ্রমজীবি জনতার আংশিক যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে সমবায়; উদাহারণ স্বরূপ বলা যায় 'কৃষি উৎপাদনী সমবায়' যা গত কয়েক বছর ধরে গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠছে। চীনদেশের বিশেষ ইতিহাসগত পরিস্থিতিতে, ক্রমশঃ ব্যাপকতর মাত্রায় এই মধ্যবর্ত্তীকালীন ব্যবস্থা অবলম্বন করে বিপুল সংখ্যক এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত শ্রমজীবী অপেক্ষা কৃত নির্ঝঞ্ঝাটে এ রকম আধা সোস্যালিষ্ট সমবায় অর্থনীতির মধ্য দিয়ে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর পূর্ণ যৌথ-মালিকানায় পৌঁছতে সক্ষম হবে।

পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যের সমাজ-তান্ত্রিক রূপান্তর আকার নেবে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ (State capitalism)। চীনের ইতিহাসগত বিশেষ অবস্থায়, আমরা পুঁজিবাদী শিল্প বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া বিভিন্ন রকমের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারি। শ্রমিক শ্রেণী শাসিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-পুঁজিবাদ বুর্জোয়াদেশের রাষ্ট্র-পুঁজিবাদের থেকে চরিত্রে ভিন্ন। লেনিনের ভাষায় "রাষ্ট্র-পুঁজিবাদ হচ্ছে এমন পুঁজিবাদ যাকে আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে পারব, যার সীমা আমরা নির্দ্ধারিত করতে পারব"। রাষ্ট্র পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে, একদিকে যেমন পুঁজিবাদী মালিকানা এখনও বিনষ্ট করা হয়নি ও পুঁজিবাদীরা মুনাফা পেতে পারে, অন্যদিকে তারা আর খুসীমত কেবল মুনাফার পেছনেই ছুটতে পারে না। রাষ্ট্র পুঁজিবাদের মধ্যবর্তী কালীন ব্যবস্থার মাধ্যমে, পুঁজিবাদী মালিকানা হটিয়ে গণ-মালিকানা প্রতিষ্ঠার পক্ষে সুবিধাজনক পরিস্থিতি রচিত হবে।

খসড়া গঠণতন্ত্র যে এই সমস্ত transi tional form সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে তা আমাদের দেশের সমাজ-তান্ত্রিক রূপান্তরের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর, শান্তিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠণের প্রশ্নের ওপর কিছু বলব। খসড়া গঠণসূচী নিয়ে দেশজোড়া আলো-চনার সময় অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেনঃ খসড়ার ভূমিকায় একথা কেন বলা হয়েছে যে আমাদের দেশের 'জন গণতন্ত্র' শোষণের বিলপ্তি ঘটিয়ে শান্তি পূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র রচনাকে নিশ্চিত করতে পারে ?

সামান্য কয়েকটি এলাকাকে বাদ দিলে আমাদের দেশে বিপ্লবী সংগ্রাম ও ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ রচনা করতে হলে পুঁজিবাদী শোষণকেও ধ্বংস করতে হবে। সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আর এক ধাপ অগ্রগতি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে, এই সামা-জিক রূপান্তর সংঘটিত করতে হলে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য মেহন্নতী জনতাকে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়ে বুর্জোয়া ডিক্টেটারশিপের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উৎখাত করতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা পুঁজিবাদী দেশের থেকে একে-বারেই আলাদা। আমাদের দেশ জন-গণের গণতন্ত্র (Peoples democ-cray) রূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেছে যার নেতৃত্ব করছে শ্রমিক শ্রেণী। আমাদের দেশে ইতোমধ্যেই একটি দ্রুত-প্রসারী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রায়ত্ব অর্থনীতি গড়ে উঠছে, যা সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির মধ্যে প্রধান চালকশক্তি হিসাবে স্থান করে নিয়েছে; আর পুঁজিবাদী অর্থনীতি তার প্রাধান্য হারিয়ে ফেলেছে। ফলে, আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পুঁজিবাদী দেশগুলোর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের থেকে ভিন্ন। আমাদের দেশে বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে উৎখাৎ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমরা বর্তমান রাষ্ট্র-যন্ত্র ও সামাজিক শক্তিগুলোর সাহায্যেই আমাদের ধাপে ধাপে সমাজ-তান্ত্রিক রূপান্তরের কাজে এগিয়ে যেতে পারি। তাছাড়া, আগেই দেখান হ'য়েছে, আমাদের দেশে শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে একটি মিত্রতার সম্পর্ক রয়েছে ১ ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য—সঃ গঃ)। কাজেই, দেশ থেকে পুঁজিবাদী শোষণ দূর করতে আমাদের আর আজকে ১৯৫০-৫২ সালের ভূমিসংস্কার করার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম তার প্রয়োজন হবে না—তখন আমরা স্বল্পকালের মধ্যে একটি ব্যাপক গণ-আন্দোলন সুরু করেছিলাম এবং এক আঘাতে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা ভেঙে ফেলেছিলাম। রাষ্ট্র কর্তৃক পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরে এবং বিভিন্ন ধরণের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে সম্পন্ন হবে। আমরা পুঁজিবাদীদের প্রয়োজনীয় সময় দেব যাতে তারা ধাপে ধাপে, রাষ্ট্র ও শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে এই পরিবর্তন মেনে নিতে পারে। বলা বাহুল্য, সংগ্রাম হবেই। সংগ্রাম এখনও হ'চ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। এখনও কিছু কিছু পুঁজিপতি বেআইনী কার্যকলাপে লিপ্ত আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের বিরুদ্ধাচরণও করছে। এই জন্যই খসড়া গঠণতন্ত্রে ব্যবস্থা রাখা হ'য়েছে "রাষ্ট্র পুঁজিবাদীগণ কর্তৃক জনস্বার্থ বিপন্ন করা, সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করা বা যে কোন প্রকার বেআইনী কার্য্য দ্বারা অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা নিষিদ্ধ করিয়া দিতেছে।" আমাদের দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের আর অস্তিত্ব নেই, এ ধারণা নিতান্তই ভুল। যে সব পুঁজিবাদী বেআইনী বা বিভেদ-মূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হবে তাদের শাস্তি দিতেই হবে। পুঁজিবাদী শোষণকে খর্ব্ব করার প্রক্রিয়া থেকে তাকে বিনষ্ট করার পথে যখন এগিয়ে যাব তখনও যে কোনরকম জটীল সংগ্রাম হবে না এ কথা চিন্তাই করা যায় না। তবে, রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রগুলোর নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রায়ত্ব অর্থনীতির নেতৃত্বদান ও শ্রমিকজনতা কতৃক তত্বাবধান মারফৎ আমাদের লক্ষ্য শান্তিপূর্ণ ভাবেই সিদ্ধ হ'তে পারে। যে পুঁজিবাদী ঘটনা-প্রবাহের গতি অনুধাবন করতে পেরেছে, যে সমাজতান্ত্রিক সংস্কারকে স্বীকার করে নিতে ইচ্ছুক, যে আইনের বিরুদ্ধাচরণ করবে না, জনগণের সম্পদকে বিনষ্ট করবে না, সে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান লাভ করতে পারবে এবং ভবিষ্যতেও তার জীবন ও জীবিকার বন্দোবস্ত করা হবে; তার রাজনৈতিক অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত হবে না। এই নীতির সংগে আমাদের সামন্ত-তান্ত্রিক ভূম্যধিকারিদের প্রতি নীতির বিরাট তফাৎ আছে। রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব ও শ্রমিক-কৃষকের বলিষ্ঠ মৈত্রী, সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে সোস্যালিষ্ট অর্থনীতির প্রাধান্য, দেশের মধ্যে ইউনাইটেড ফ্রন্ট ও অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি—এই সবকিছু মিলে যে পরিবেশ রচনা করেছে তাতে আমাদের দেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে শোষণ-বিলুপ্ত করা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ রচনা করা সম্ভব হবে।

এবার ধনী কৃষকদের প্রশ্নে আসা যাক। খসড়া গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে; "ধনী কৃষকদিগের প্রতি রাষ্ট্রের নীতি হইল সংকোচন ও ধীরে ধীরে বিলোপ সাধন", এ কথা বলতে কী বোঝায় ?

আমরা জানি ধনী কৃষক অর্থনীতি হ'ল গ্রামাঞ্চলের পুঁজিবাদী অর্থনীতি; ধনী কৃষকরা হ'ল গ্রামাঞ্চলের শেষ শোষক শ্রেণী। আমাদের দেশে ধনী কৃষক অর্থনীতি কোনদিনই খুব ভাল ভাবে বিকাশ লাভ করে নি। জমির যে অংশ তারা ভাড়া দিত সেটা ভূমি সংস্কারের ফলে নতুন করে বিলিয়ে দেয়া হয়েছে। এই সংস্কারের পর থেকে, উৎপাদন, সরবরাহ, বাজার, ঋণ-দান প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারে সমবায় সমিতির প্রচলন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক শস্য ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের ক্রয় ও বন্টনের ঐক্যবদ্ধ নীতি গ্রহণ করার ফলে ধনী-কৃষক অর্থনৈতিক কাঠামো আরো ম্রিয়মান হ'য়ে পড়েছে। বর্ত্তমানে ধনী কৃষকের দখলে গড়পড়তা জমি সাধারণ চাষীর মাত্র দ্বিগুণ। যে সব ধনী কৃষক আগে শ্রমিক ভাড়া করত, সুদের ব্যবসা করত, বাণিজ্য করত তাদের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। কাজেই গ্রামাঞ্চলের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা সম্ভব হবে। অবশ্য

(শেষাংশ ১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নেহরু সরকারের বৈদেশিক নীতির স্বরূপ

নেহরু সরকারের বৈদেশিক নীতি ভারতবর্ষের জনসাধারণকে এক মারাত্মক বিভ্রান্তির পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে। কেবলমাত্র জনসাধারণই নয়, নেহরু সরকারের বিরোধী বামপন্থী দলগুলি পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই আজ বিভ্রান্ত হয়েছে। কোন কোন রাজনৈতিক দল নেহরুর বৈদেশিক নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশ্লেষণ না করেই একদফা নেহরুকে এবং অপরদফা দুনিয়াশুদ্ধু ষ্ট্যালিনবাদীদের (সাম্যবাদীদের) গালাগালি দিয়ে দায় সারছেন এবং অপরদলগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেহরুজী কবে, কোথায় এবং কি কি ভাল কাজ করেছেন তার ফর্দ বানিয়ে নেহরুজীকে প্রগতিশীল প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। একদিকে আর, এস, পি প্রভৃতি দলগুলির সোভিয়েট ও চীন সম্পর্কে অন্ধ বিরোধীতার মনোভাব এবং ট্রটস্কিপন্থী আচরণ এবং অপরদিকে কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি দলগুলির নেহরু দালালীর নীতি, দুইই আজ জনসাধারণকে বিভ্রান্তির জালে জড়িয়ে পড়তে সাহায্য করছে।

আর, এস, পির মুখপত্র 'গণবার্ত্তা' ২৫শে জুন লিখেছেন "পণ্ডিত নেহরু এবং ষ্ট্যালিনবাদীদের শান্তির ফরমুলায় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং শ্রমজীবি জনসাধারণের রাষ্ট্রক্ষমতার ভিত্তিতে প্রকৃত" শান্তি আসিবে না" অথবা "সাম্প্রতিক কালের পররাষ্ট্র নীতির চাপে ব্রিটিশ ব্লকের সহিত মৈত্রী স্থাপনের ফলে সোভিয়েট নেতৃত্ব নেহরু প্রশংসায় গদগদ। সোভিয়েট ব্লকের অন্তর্ভুক্ত চীনের চৌ-এন লাইকে আসিয়া ভারতের নেহরু সরকারকে জনগণের অভীষ্ট সরকার বলিয়া ঘোষণা করিতে হইয়াছে। (গণবার্ত্তা ১০ই সেপ্টেম্বর) অপরদিকে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি নেহরুর জয়ঢাক কাঁধে ক'রে প্রচারে বেরিয়েছেন। নেহরু পররাষ্ট্র নীতিকে প্রায় পূর্ণ সমর্থন ক'রে এবং নেহরুজীকে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা আজ পর্য্যন্ত এত বিবৃতি দিয়েছেন যা প্রকাশ ক'রতে হ'লে আমাদের গণদাবীর আকার বাড়াতে হ'বে। তবু প্রয়োজন বোধে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এখানে তুলে দেওয়া হ'ল। গত ১২ই জানুয়ারী '৫৪ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন "জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সরকার এমন কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়াছেন যাহার ফলে শান্তির পথ সুগম হইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস পাইয়াছে।" (যুগান্তর ১৩ই জানুয়ারী) কমিউনিষ্ট পার্টির পলিটবুরোর সদস্য ই, এম, এস নাম্বুদ্রিপাদ গত ২রা জানুয়ারী মাদুরায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন পণ্ডিত নেহরু যদি তাঁহার বর্ত্তমান মনোভাবে দৃঢ় থাকেন এবং উহা পরিবর্ত্তন না করেন তবে এ ব্যাপারে কমিউনিষ্ট পার্টি **দৃঢ়ভাবে** তাঁহার **সমর্থনে দাঁড়াইবে**। নাম্বুদ্রিপাদ আরও বলেন যে, **মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ গ্রহণেও তাঁহার পার্টি নেহরুকে সমর্থন করিবে,** (our emphasis) যদি এই সাহায্য আইজেন হাওয়ার ও ডালেস যে প্রকৃতির সাহায্য দিতে চান সেই প্রকৃতির না হয়"—(স্বাধীনতা ৩-১-৫৪)। পাক মার্কিণ সামরিক চুক্তি সম্পর্কে নেহরুর নীতিকে খোলাখুলি অভিনন্দন জানিয়ে পলিটব্যুরো ২রা মার্চ '৫৪ এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন "Pandit Nehru's statement in Parliament on March 1 '54 defining the attitude of the Govt. of India towards the military assistance given by the U. S. A to Pakistan will receive whole hearted support from every patriotic indian." (our emphasis) ইন্দোচীনের ক্ষেত্রে নেহরু নীতিকে পূর্ণ সমর্থন ক'রে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম চিন্তানায়ক হীরেন মুখার্জি পার্লামেণ্টে বলেছেন "The voice of India (meaning India govt.—Editor) to day is always raised on

নেহরু স্তুতিই কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্তমান রাজনীতি

the side of **peace and freedom of the peoples"** (our emphasis) (New age May 23 '54) চৌ-নেহরু শান্তি নীতিকে সমর্থন করতে গিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা রামমূর্তি লিখেছেন "All peace loving mankind are enthused by the fact that Nehru, despite the noose that the U. S. A set in those agreements, has today taken a stand against many of the U. S. machinations in Asia and against its threat to India" (New age July 18 '54) কোরিয়ার ক্ষেত্রে নেহরু সরকারকে প্রশংসা করে একই প্রবন্ধে বলা হয়েছে—"**Our own general** Thimmayya's letters stand witness to the U. S. perfidy and to the sincere adherence of the Chinese to the letter and spirit of the armistice agreement" (our emphasis)(New age July 18 '54) অতএব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে নেহরুর বৈদেশিক নীতিকে প্রশংসা করা, অভিনন্দন জানান এবং কচিৎ কখনও দুর্বল (!) বলে একটু খুং খুং করা ছাড়া আজ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি এ সম্পর্কে কিছু করণীয় আছে বলে মনে করেন না। জনসাধারণকে ত তাঁরা পরিস্কার বলছেন যদি দেশকে ভালবাস ত নেহরুর পাশে এসে দাঁড়াও, কারণ নেহরুজী শান্তি চান। ফলে, যে জনসাধারণ জাতীয় ক্ষেত্রে নেহরু সরকারের চরিত্রকে লাঠি, গুলি, ও টিয়ার গ্যাসের দৌলতে অতি দ্রুত সঠিকভাবে চিনে নিচ্ছিল সেই জনসাধারণই এই পররাষ্ট্র নীতির জাঁকজমকে নূতন ক'রে মোহাচ্ছন্ন হচ্ছে এবং ভারতের জাতীয় পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষা এবং নিজেদের জীবনের সবচেয়ে ঘৃণিত শত্রু নেহরু সরকারের প্রতি নতুন ক'রে আশা ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে শুরু করছে। কিন্তু এই মিথ্যা আশাকে আজ যদি জনসাধারণের মন থেকে দূর করা না যায় এবং নেহরু নীতির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সচেতন না করা হয় তবে শত্রুর দুর্গ ক্রমশঃই দুর্ভেদ্য হয়ে উঠবে এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণের মুক্তি আন্দোলন বহুদিনের জন্য পিছিয়ে যাবে।

বর্তমান যুগে কোন দেশের বৈদেশিক নীতিকে আলোচনা করতে হ'লে কতকগুলি মূল বিষয়ের প্রতি নজর রাখা প্রয়োজন। প্রথম কথা, আজকের যুগে কোন রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি ঐ রাষ্ট্রের কোন বিশেষ নেতা বা ব্যক্তির 'সদিচ্ছা' বা 'দুরভিসন্ধি'র উপর নির্ভর করে না। কোন রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি বলতে আজ বোঝায় যে শ্রেণীর হাতে ঐ রাষ্ট্র সেই শ্রেণীরই বৈদেশিক নীতি। শ্রেণীর ঊর্ধ্বে রাষ্ট্র হওয়া অসম্ভব। তাই রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি মাত্রেই কোন না কোন শ্রেণীর আশা-আকাংখা প্রকাশ করতে বাধ্য। সুতরাং কোন রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিকে বুঝতে হ'লে প্রথম বিচার করা দরকার ঐ রাষ্ট্র কোন শ্রেণীর এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেই শ্রেণীর স্বার্থ, উদ্দেশ্য বা অভিলাষ কি এবং তার সামনে বর্তমানে মূল সমস্যা গুলিই বা কি কি। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রের মালিক হয় শোষক শ্রেণী অথবা শোষিত শ্রেণী। সুতরাং রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি হয় মূলতঃ শোষক শ্রেণীর অথবা শোষিত শ্রেণীর স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী গড়ে ওঠে। জাতীয় ক্ষেত্রের ন্যায় বৈদেশিক স্বার্থ বিচারের প্রশ্নেও শোষক ও শোষিত শ্রেণীর স্বার্থ এক নয়, বরং পরস্পর বিরোধী কাজেই তাদের বৈদেশিক নীতিও আলাদা। সেইজন্যই শোষক শ্রেণীর রাষ্ট্র ও শোষিত শ্রেণীর রাষ্ট্রের মধ্যে বৈদেশিক নীতির মূলগত পার্থক্য থাকতে বাধ্য। তাই এমন কোন বৈদেশিক নীতির অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব যা শোষক ও শোষিত উভয় শ্রেণীর স্বার্থকেই একত্রে প্রকাশ করতে পারে। অতএব দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পুঁজিপতি জমিদার ও অন্যান্য শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে শ্রমিক কৃষক ও শোষিত জনসাধারণের আন্দোলনকে ধ্বংস করছে এমন কোন রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি যত রং চং-ই হোক, তাকে চিনে নেওয়া কষ্টকর নয় মোটেই।

আবার আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও শান্তির পটভূমিকা ছাড়া এই বৈদেশিক নীতিকে ঠিকমত বিচার করা যায় না। কারণ বর্তমানে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন একটা বাস্তব প্রশ্ন। দুনিয়ার শোষক ও শোষিত শ্রেণী দুইটি পৃথক পরস্পর বিরোধী স্বার্থের ভিত্তিতে দুইটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই প্রশ্নকে বিচার করছে। কাজেই বর্তমান যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যাকে কেন্দ্র করে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলি দুইটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই দুই শিবিরে বিভক্ত পৃথিবীতে কোন্ রাষ্ট্রের অবস্থান কোথায়, তা বুঝতে হ'লে দেখা দরকার যে শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রযন্ত্র সেই শ্রেণী এই আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নকে নিজের স্বার্থ অনুযায়ী কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করছে।

সুতরাং আজকের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে, 'নিরপেক্ষ' কথাটা সম্পূর্ণ অর্থহীন। কারণ রাষ্ট্র মাত্রেই হয় শোষক নয় শোষিত শ্রেণীর রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে এই দুই শ্রেণী পরস্পর বিরোধী দুই স্বার্থের শিবিরে বিভক্ত। এই দুই পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ শিবিরের কোনটাকেই শক্তিশালী করে না অথবা উভয়কেই শক্তিশালী করে এমন কোন রাষ্ট্র বা তার বৈদেশিক নীতি থাকতে পারে না। অতএব কোন রাষ্ট্রের পক্ষে আজ প্রকৃত 'নিরপেক্ষতা'র কল্পনা করাও চলতে পারে না।

সারা দুনিয়া জুড়ে আজ দুইটি পরস্পর বিরোধী শিবিরের লড়াই চলেছে। একটি ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদী যুদ্ধবাজ শিবির এবং অপরটি চীন-সোভিয়েটের সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবির। পুঁজিবাদী যুদ্ধবাজ শিবির যুদ্ধ চায় এবং এই যুদ্ধ মারফং সোভিয়েট ও চীনের সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে ধ্বংস করতে চায়। তার কারণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বাজারই বর্তমানে সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র ও একমাত্র বাজার নয়। পুঁজিবাদী বাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজ দুনিয়ার এক বিরাট অংশ জুড়ে গড়ে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক বাজার। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির 'সংকটহীন' ও অপ্রতিহত উন্নতির ফলে এই সমাজতান্ত্রিক বাজারের ক্রমবর্দ্ধমান প্রসার ঘটছে এবং পুঁজিবাদী বাজার এখন সংকুচিত হচ্ছে। কাজেই সারা দুনিয়া জুড়ে পুঁজিবাদীদের অবাধ মুনাফা লোটার স্বাধীনতা ক্রমশঃই সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত হয়ে পড়ছে। আর যতই এই অবাধ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হচ্ছে ততই মুনাফার বখরা নিয়ে ও বাণিজ্যিক অধিকার নিয়ে পুঁজিবাদীদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও অন্তর্বিরোধ উগ্র হয়ে উঠছে; ফলে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। দুনিয়ার পুঁজিবাদী জোট ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং সমাজতান্ত্রিক বাজারের বিকাশের অধিকতর সুবিধা মিলছে। কাজেই বিশ্ব পুঁজিবাদের পতনের দিনকে নিকটতর করছে, সোভিয়েট ও চীনের সমাজতান্ত্রিক বাজার এবং তার ক্রমবর্ধমান প্রসার। এই অনিবার্য্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার আশাতেই বিশ্ব পুঁজিবাদ আজ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। অপর পক্ষে সমাজতান্ত্রিক শিবির চায় শান্তি। তার কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতির মত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে 'ব্যক্তিগত মুনাফা' ও 'অধিক উৎপাদনের সংকট' বলে কোন বস্তু নেই। কাজেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে বিপর্য্যয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দেশের মধ্যে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে হয় না অথবা বিদেশে উপনিবেশ গড়বার প্রয়োজন হয় না। তাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ বাধাহীন, অপ্রতিহত। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে 'ব্যক্তির মুনাফা' অর্জনের কোন সুযোগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে নেই বরং, লোকক্ষয়কর যুদ্ধ এই উন্নতির পথে বাধারই সৃষ্টি করবে। কাজেই এই শিবির শান্তি চায়। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ আজ অন্ততঃ কিছুদিন টিঁকে থাকারও পরোয়ানা লাভ করতে পারে। পুঁজিবাদের নিজস্ব অন্তর্বিরোধ দিন দিন চূড়ান্ত আকার ধারণ করছে। এই অন্তর্বিরোধ যতই উগ্র হচ্ছে, বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট ততই ঘনীভূত হচ্ছে এবং দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পুঁজিবাদের অবসানের পথ ততই প্রশস্ত হচ্ছে। নূতন এক বিশ্বযুদ্ধের জালে দেশকে জড়িয়ে ফেলতে না পারলে অর্থাৎ একদিকে সমস্ত শিল্প ও অর্থনীতিকে সামরিক অর্থনীতিতে পরিণত করতে এবং অপর দিকে 'জাতীয় ঐক্য' এবং 'জরুরী অবস্থা'র দোহাই দিয়ে সর্বপ্রকার গণ-আন্দোলনকে দমন করতে না পারলে এই বিপদের হাত থেকে তার উদ্ধার নেই। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক শিবির আজ সর্বপ্রকার যুদ্ধায়োজনের তীব্র বিরোধিতা করে একদিকে অর্থ লোকক্ষয়ের হাত থেকে দুনিয়ার সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছে অপরদিকে পুঁজিবাদের উচ্ছেদের পথ পরিষ্কার করে স্থায়ী বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠার দিনকে নিকটতর করছে। সুতরাং সোভিয়েট ও চীনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবিরের সংগে

দুই শিবির, দুই রাষ্ট্র ব্যবস্থা, দুই বাজারের পটভূমিকাতেই বিশ্ব সমস্যার সঠিক বিশ্লেষণ সম্ভব

ইঙ্গমার্কিণ নেতৃত্বে পুঁজিবাদী যুদ্ধ শিবিরের এক দুনিয়া জোড়া দ্বন্দ্ব চলেছে। মার্কিণ যুদ্ধায়োজনকে পদে পদে প্রতিরোধ করাই আজ সোভিয়েট ও চীনের বৈদেশিক নীতির একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু পুঁজিবাদী যুদ্ধবাজ শিবির যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আজও কার্য্যতঃ ঐক্যবদ্ধ নয়। তার কারণ পুঁজিবাদী শিবিরের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ বিরোধ রয়েছে। প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশই চায় আপন পুঁজির প্রসার ঘটাতে, অধিক হারে মুনাফা অর্জন করতে এবং সম্ভব হ'লে বিদেশের বাজার দখল ক'রে একচেটিয়াভাবে বাণিজ্য ক'রে নিজেদের জাতীয় শিল্পকে সংকটমুক্ত রাখতে। কিন্তু ভৌগলিক আবিষ্কারের ফলে আজ বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশ, প্রতিটি দ্বীপ পর্য্যন্ত মানুষের কাছে জানা হ'য়ে গেছে এবং কোন না কোন পুঁজিবাদী দেশের বাজারের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়েছে। নতুন কোন উপনিবেশ আবিষ্কৃত হবারও বিশেষ কোন সম্ভাবনা আর নেই। পুঁজিবাদী বাজারকে প্রসারিত করার সামনে আজ এক বিরাট সমস্যা। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক বাজারের উন্নতি ও প্রসারের ফলে পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল আজ পুঁজিবাদীদের হাত ছাড়া। তাই পুঁজিবাদীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংকট দিনের পর দিন চূড়ান্তরূপ নিতে চলেছে।

আমরা দেখছি যে, মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও তার প্রভাবাধীন দেশগুলির সংগে ব্রিটিশ একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও তার তল্পিবাহক দেশগুলির মধ্যে এক বিরাট স্বার্থদ্বন্দ্ব দিন দিন নগ্নভাবে দেখা দিচ্ছে। সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধায়োজনে মার্কিন ও ব্রিটিশ পুঁজিবাদের স্বার্থ এক হ'লেও দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। কিন্তু মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিবাদের উপর নির্ভর না ক'রে ব্রিটিশ পুঁজির পক্ষে বর্ত্তমানে স্বাধীন ভাবে টিকে থাকাই অসম্ভব, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি করা ত' দূরের কথা। আবার অন্যদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির সমর্থন ও সাহায্য ছাড়া মার্কিন পুঁজিবাদের পক্ষে একা একা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাও সম্ভব নয়। প্রথমোক্ত কারণে দেখা যায় যে দুনিয়ার যেখানেই আজ ঔপনিবেশিক জনগণের মুক্তি আন্দোলনের চাপে সাম্রাজ্যবাদ বিপদাপন্ন সেখানেই তার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক ও আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ মালয়, গায়নাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এবং মরক্কো ও ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আমেরিকার সাহায্য ছাড়া দাঁড়াতে পারেনি। অপরদিকে আবার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীও যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী দেশকে হাতের মুঠোয় পাচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না এবং সোভিয়েট বিরোধী সমরায়োজনের প্রস্তুতিও ততদিন পাকা হয় না। তাছাড়া মার্কিণ একচেটিয়া পুঁজির উন্নতিকে অব্যাহত রাখতে তাকে আজ পুঁজিরও প্রসার ঘটাতে হচ্ছে। দুনিয়ার এক বিরাট এলাকা পুজিবাদীদের হাত ছাড়া। কাজেই একদিকে নিজের অর্থনীতির সংকট এড়াতে অপরদিকে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশকে পুরোপুরিভাবে নিজের তাঁবে আনতে গিয়ে আমেরিকাকে আজ অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের সংগে তীব্র প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছে। ডলার ষ্টার্লিং প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। পুরাণ সাম্রাজ্যবাদীদের ঘাঁটি দখল ক'রে বসছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ইউরোপের সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জাতীয় অর্থনীতিকে সে করতলগত ক'রে ফেলতে চায়। কিন্তু মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব করায় অন্যান্য পুঁজিপতিদের স্বার্থের হানি হয়। কাজেই নিজেদের পুঁজির স্বার্থে ও ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষার জন্য এইসব পুজিবাদী দেশ আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্বকে মেনে নিতে রাজী নয়। মার্কিণ প্রভাবাধীন এলাকার সংগে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ও তার সংশ্লিষ্ট দেশগুলির বিরোধ ঘটছে এই কারণেই। এই অন্তর্বিরোধের ফলে আজ একদিকে যেমন মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধপ্রস্তুতিতে ফাটল ধরেছে এবং ব্রিটিশ, ফরাসী ও অন্যান্য ছোটখাট পুঁজিপতিরাও কতকটা স্বাধীনভাবে আচরণ করার সুযোগ নিতে চেষ্টা করছে, অপরদিকে তেমনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এ সম্পর্কে তৎপরতা ও সতর্কতাও উত্তোরত্তর বেড়ে চলেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সংগে আজ যেভাবে স্বার্থদ্বন্দ্বে লিপ্ত, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলির সংগে খাস ব্রিটিশ পুঁজিপতিদেরও তেমনি স্বার্থ কলহ রয়েছে। কমনওয়েলথ ভুক্ত কতকগুলি দেশের কতকটা স্বাধীন মনোভাব এবং কখনও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আওয়াজ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের নিজস্ব অন্তর্বিরোধকে প্রকাশ করছে। এককথায় বলতে গেলে দুনিয়ার প্রত্যেকটী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই এই অন্তর্বিরোধের সংগে জড়িত। এমনকি খুব ছোট এবং অনুন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিও আজ পুঁজিবাদের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিশেষ ক'রে ইঙ্গমার্কিণ গোষ্ঠীর পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাতকে বিশেষভ'বে লক্ষ্য করছে এবং তার সুযোগ নিয়ে উভয় পক্ষের সংগেই দরকষাকষি ক'রে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে। [illegible] আবদুল্লার মত নগণ্য এক শাসনকর্তা, 'বাওদাই'-এর মত এক দুর্বল অপদার্থ [illegible] কিংবা সিংহলের মত ক্ষুদ্র এক পুজিবাদী দেশও আজকের দুনিয়ায় স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন দেখে এবং ইঙ্গমার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের মত অতিকায় শক্তির সংগেও দরকষাকষি করতে সাহস করে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নূতন অবস্থাকে বুঝতে হ'লে এই তথ্যগুলিকে স্মরণ রাখা দরকার'।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতের বৈদেশিক নীতিকে বিশ্লেষণ করতে হবে। ভারতবর্ষ পুজিবাদী রাষ্ট্র, কাজেই বিশ্ব পুজিবাদের শিবিরেই তার অবস্থান। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রেও ভারত সোভিয়েট ও চীনের শান্তির শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশ নয়। কাজেই নেহরুজী নিরপেক্ষই থাকুন আর সোভিয়েট ও চীনের প্রতি মৌখিকভাবে যত দরদই দেখান, একথা জলের মত সহজ যে বিশ্বশান্তির শিবিরের স্বার্থরক্ষা করা ভারতের বৈদেশিক নীতির মূল উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শান্তির শিবিরের স্বার্থ যদি নেহরু সরকারের স্বার্থ না হয় তাহলে অন্য কোন্ শিবিরের স্বার্থকে সে রক্ষা করে? বর্ত্তমান দুনিয়ায় মূলগতভাবে দুইটি মাত্র শিবির, তৃতীয় শিবিরের অস্তিত্ব অসম্ভব। অতএব নেহরুজী যার সংগে খুশী বন্ধুত্ব করুন এবং সে বন্ধুত্ব মারফৎ শান্তি শিবিরের কার্য্যতঃ যদি কিছু সুবিধাও হয় তবুও নেহেরু সরকার পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক যুদ্ধবাজ শিবিরের অন্তর্ভুক্ত। তাই যে সমস্ত রাজনৈতিক দল আজ নেহেরু সরকারকে শান্তিবাদী বলে প্রশংসার ঢাক পিটিছেন তাঁরা যে সকলেই একটি মৌলিক ভুল করছেন, এ সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে নেহেরু সরকার কি তাহলে পুরোপুরি ভাবেই আমেরিকা বা ইংরেজের হাতের পুতুল? তার কি নিজের করবার কিছুই নেই? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে নেহেরু সরকার কি যুদ্ধ প্রস্তুতির দায়িত্ব নিচ্ছে?

এই প্রশ্নগুলির জবাব পেতে হলে প্রথমেই খেয়াল করতে হ'বে নেহেরু সরকার ভারতবর্ষের দেশী পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিনিধি। মার্কিন পুজিবাদের সংগে ভারতের পুজিবাদের বৃহত্তর স্বার্থের দিক দিয়ে কোন মূলগত পার্থক্য নেই। জনসাধারণকে শোষণ করে মুনাফালো[illegible] প্রশ্নে অথবা কমিউনিজমের প্রসারণে প্রতিরোধ করার প্রশ্নে দুজনেই একমত। কাজেই নেহেরু সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শত্রু নয়।

কিন্তু ভারতীয় পুজিপতিরা আবার প্রচুর মুনাফা কামাবার স্বার্থে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করার পক্ষপাতি এবং মার্কিণ পুজিবাদের দাসত্ব করতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। সেদিক থেকে সর্বগ্রাসী একচেটিয়া মার্কিন পুজির সঙ্গে ভারতীয় একচেটিয়া পুজির স্বার্থ বিরোধ। কাজেই যদিও নেহেরু সরকারকে মূল প্রশ্নগুলিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দাবীকেও মেটাতে হয় তবু তাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল বলা যায় না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেহেরুজীর বৈদেশিক নীতি কখনও কখনও মাকিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে আবার মূল প্রশ্নগুলিতে তাকে সন্তুষ্ট করেই চলে। সেদিক থেকে চার্চিলের পররাষ্ট্র নীতির সংগে নেহেরু নীতির একটা বিরাট মিল রয়েছে। তার কারণ আজকের ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির পিছনেও ব্রিটিশ পুজিপতিদের রয়েছে একই ধরণের স্বার্থ; এবং একই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী। কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ গ্রেটব্রিটেনের পরম বন্ধু। নেহেরুজীর কাছে দেশী পুঁজির স্বার্থের পরই ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অন্তর্বিরোধই নেহরুর "সোভিয়েট প্রীতির" কারণ

পুঁজির স্বার্থ। ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থ দ্বন্দ্বে ভারতবর্ষ ব্রিটেনের দলে যোগ দিয়েছে। তাই নেহেরুজীর কণ্ঠে আজ যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার আওয়াজ তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিঃ চার্চিলের আওয়াজের প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু নেহেরুজীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল মনে করাও ভুল। রাজনৈতিক জগতে নেহেরুজী ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণীর আশা আকাংখারই প্রতীক। এই কারণে কেবল মাত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাই নয় ভারতের দেশী পুঁজিবাদের স্বার্থের খাতিরে তাকে আজকাল মাঝে মাঝে সমস্ত পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারা এশিয়ার মুক্তির জন্যও হাঁক ডাক করতে হয়। ফরাসী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে নেহেরু সরকারের এই ঝগড়া ভারতের দেশী পুঁজিবাদের প্রসারের স্বার্থেই। কিন্তু এর থেকে জনসাধারণ অনেক সময় ভুল করে ভাবেন যে নেহেরু শান্তির স্বপক্ষে। এই ভুল করার কোন কারণ নেই। পুঁজিবাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ অনিবার্য, স্বভাবজাত। তাই আসলে পুঁজিপতিরা কেউ কাহারও বন্ধু নয়। যতটুকু বন্ধুত্ব তা কেবল পুঁজির স্বার্থে পুঁজিবাদের সাধারণ শত্রু বা Common enemyর বিরুদ্ধে। কিন্তু নিজ নিজ পুঁজির স্বার্থে তারা প্রয়োজন হ'লে যেমন নিজেদের মধ্যেই লড়াই করে তেমনি আপাতঃ লাভের আশায় পুঁজিবাদের সাধারণ শত্রু সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংগেও বন্ধুত্ব করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ গত মহাযুদ্ধের আরম্ভের সময় নাৎসী জার্মাণীর সংগে সোভিয়েটের সামরিক অনাক্রমণ চুক্তি ঘটেছিল। কিংবা যুদ্ধের সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েটের বন্ধু ছিল। কিন্তু তার দ্বারা কি প্রমাণিত হয়েছে কি হিটলার, কি ইঙ্গ মার্কিন গোষ্ঠী দুয়ের মধ্যে কেউ প্রকৃত শান্তির স্বপক্ষে?

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয়ঘোষ নেহেরুর কতকগুলি কাজকে শান্তির স্বপক্ষে বলে প্রশংসা করছেন। কিন্তু শান্তির উদ্দেশ্যে কি সেই মহান কাজ? উত্তরে হয়ত কমিউনিষ্ট পার্টি বলবেন কেন কোরিয়া কলম্বো, জেনেভা সম্মেলন—এগুলি মারফৎ কি ভারতের শান্তিনীতি ও সদিচ্ছা প্রমাণিত হয়নি? অবশ্য এই বিষয় গুলির প্রত্যেকটির সম্পর্কে আলাদা আলাদা ভাবে বহুবার আমরা "গণদাবী"তে আলোচনা করে নেহেরু নীতির তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু তবু প্রসঙ্গক্রমে এখানেও এইগুলির উপর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল যার থেকে পরিস্কারভাবে প্রমাণ হয়ে যাবে যে এই প্রত্যেকটী ক্ষেত্রেও নেহরু নীতি প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়েছে। প্রথমে ধরা যাক কোরিয়ার প্রসঙ্গ। কোরিয়ার যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের প্রশ্নে সোভিয়েট প্রস্তাব করেছিল, অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ ক'রে বিনা সর্ত্তে যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যর্পণ করতে হবে কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ গোষ্ঠী দেখল যে এই প্রশ্নটা যদি শান্তিপূর্ণ ভাবে মীমাংসিত হয়ে যায় তবে যুদ্ধ বন্ধ করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকেনা। কোরিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার অর্থ মার্কিণ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দা এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব গোলার্দ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় জনগণের সামরিক বিজয়কে স্বীকার ক'রে নেওয়া। তাছাড়া আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষার জন্য যে বিপুল প্রাণী বাহিনীকে (যুদ্ধ বন্দীদের) 'হিউম্যান গিনিপিগ' হিসাবে ব্যবহার করার স্বপ্ন ছিল তাও ভেঙে যায়। কাজেই আমেরিকা পাল্টা প্রস্তাব করে বসল যে যুদ্ধবন্দীদের মতামত ছাড়া তাদের দেশে পাঠান যেতে পারে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কিন্তু এই বিষয়ে আমেরিকার সঙ্গে একমত হলেও, কোরিয়ার ক্ষেত্রে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের স্বার্থের ততটা মিল ছিল না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত যে কোন প্রকারে শান্তি চুক্তিকে বানচাল করে যুদ্ধ চালানর দায়িত্ব ঘাড়ে নিতেও ব্রিটেন প্রস্তুত ছিল না। কাজেই সোভিয়েট প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কারুর মনেই তখন এতটুকু সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন অবস্থায় ভারতবর্ষ তার নিরপেক্ষতার মুখোসে হাজির করল এক তৃতীয় প্রস্তাব, যার মাধ্যমে সে একদিকে ব্রিটিশ ব্লকের স্বার্থরক্ষা করল, অপরদিকে মার্কিণ প্রস্তাবের মৌখিক বিরোধিতা করা সত্ত্বেও মূল প্রশ্নে আমেরিকাকে সন্তুষ্টই করল। ভারতীয় প্রস্তাবেরও মূল বক্তব্য ছিল, বাধ্যতামূলক বন্দীবিনিময় মানবতা বিরোধী। কিন্তু এই যুদ্ধবন্দী বিনিময় তত্ত্বাবধান কারী কমিটির চরিত্র সম্পর্কে আমেরিকা তখনও নিঃসন্দেহ হ'তে পারেনি। কাজেই প্রথমটায় কিছুটা আপত্তি উঠল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভারত জাতিসংঘ বা মার্কিণ ব্লকের কর্ত্তৃত্বে একজন 'আম্পায়ার' বা মধ্যস্থ নিয়োগ করার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে পূর্ব ত্রুটি সংশোধন করল এবং আমেরিকারও মন ভিজল। এদিকে সোভিয়েটের বন্দী-মুক্তি প্রস্তাবে কর্ণপাত না করেও আমাদের দেশের পত্রিকা মারফৎ বড় বড় হরফে ছাপা হ'ল যে বন্দীমুক্তির ব্যাপারে ভিশিনিস্কির দাবীকেই সংশোধিত আকারে মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ তাঁবদারীতে নেহরুজীর এই চীন দরদ শেষ পর্য্যন্ত ধোপে টেকে নি। ভারতের মনোভাবের পরিচয় পেয়ে সোভিয়েট দৃঢ়ভাবে ভারতের এই প্রস্তাবকে ঘৃণার সংগে প্রত্যাখ্যান করল। তৎক্ষণাৎ পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট আনন্দে নেচে উঠে তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিল যে সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধ চায়। এমনকি আমেরিকা নিজের প্রস্তাবকে প্রত্যাহার করেও ভারতের প্রস্তাব আলোচনার জন্য স্থান ছেড়ে দিল। পিকিং রেডিও সেদিন বলিষ্ঠ ভাবেই ঘোষণা করেছে "ভারতবর্ষ বিবাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে এসে আমেরিকার শিবিরে ভিড়ে গেল।' চৌ-এন-লাই তখন সাধারণ পরিষদের সভাপতিকে এক জবাবে লিখেছিলেন "আপনারা কেহই কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করছেন না। আপনারা জাতিসংঘের অন্তর্গত কয়েকটী জাতিকে দিয়ে আমেরিকার কর্মনীতিকে সম্মিলিত ভাবে সমর্থন করিয়ে নেবার জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন।" ভারতের মৌখিক সোভিয়েট প্রীতি ও লালচীনের প্রতি একচেটে দরদ ও নিরপেক্ষতার কালো মুখোস সমস্তই সেদিন একঘায়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গিছল। যে কোরিয়ায় যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের দায়িত্ব নিয়ে ভারত জগৎ জোড়া বাহবা পেল তার পরিণতিতেই শেষ পর্য্যন্ত "আমাদের জেনারেল থিমাইয়া" (সুন্দরাইয়াজীর ভাষায়) ২২০০০ যুদ্ধবন্দীকে মার্কিণ জহ্লাদের হাতে সমর্পন ক'রে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

অজয় ঘোষ বর্ণিত নেহরুজীর আরও দু একটি ভাল ভাল কাজকে লক্ষ্য করা যাক।

জেনেভা সম্মেলনে ইন্দোচীনের যুদ্ধ বিরতির প্রশ্নে ভিয়েৎমিন সরকার ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর তরফ থেকে যে দুইটী পাল্টা প্রস্তাব হাজির করা হয়েছিল তাদের মূল সর্ত্তগুলি এই প্রকার। ভিয়েৎমিন প্রস্তাবের প্রাথমিক সর্ত্তগুলি হল ইন্দোচীনের পূর্ণ স্বাধীনতা, **সমস্ত বিদেশী সৈন্যের অপসারণ** বন্দী বিনিময় ও গণনির্বাচন, ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওসের স্বাধীনতা এবং এই সর্ত্তগুলির ভিত্তিতে যুদ্ধ বিরতি। ফ্রান্সের প্রস্তাব, আন্তর্জাতিক শক্তিবর্গ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধবিরতি হবার পূর্বেই ভিয়েৎমিনদের সারা লাওস, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েৎনাম ছেড়ে উত্তরে হটে যেতে হবে এবং সমস্ত অনিয়মিত সৈন্যের (অর্থাৎ গেরিলা বাহিনী) হাত থেকে অস্ত্র শস্ত্র কেড়ে নিতে হবে। এককথায় ফ্রান্স যুদ্ধক্ষেত্রে যা যা হারিয়েছে, জেনেভার টেবিলে বসে সেইগুলিই আব্দার ক'রে বসল। ইন্দোচীনের মাটিতে ফ্রান্সের কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকারও নেই। কাজেই প্রত্যেকটি সদিচ্ছা সম্পন্ন ও শান্তিকামী মানুষই ভিয়েৎমিনদের প্রস্তাবকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবেন। কিন্তু মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ ইন্দোচীনে সামরিক ঘাঁটি করার আশা এককথায় ছেড়ে দিতে পারে না। কাজেই নানা কৌশলে যুদ্ধের আগুনকে জিইয়ে রাখবার জন্যই সে বদ্ধপরিকর হ'ল এবং ফ্রান্সের উপর চাপ দিতে লাগল। আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইন্দোচীনের যুদ্ধে বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল না। কাজেই ইন্দোচীনের ব্যাপারে সরাসরি আমেরিকাকে সাহায্য করতে সে নারাজ ছিল। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সোজাসুজিই বলেছিলেন—"British Government is not prepared to give any undertaking about United kingdom military action in Indo-China in advance of the results of Geneva" (27th April '54) কাজেই নেহরুজী এক তৃতীয় প্রস্তাব, যার মারফৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কিছুটা বিরোধিতা করেও ব্রিটিশ নীতিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা হ'ল, ভিয়েৎমিন প্রস্তাবের সোজাসুজি বিরুদ্ধতা না করেও নুতন সমস্যার সৃষ্টি ক'রে আলোচনাকে ধোঁয়াটে করে তোলা গেল, আবার বিশ্ব জুড়ে প্রশংসা

(শেষাংশ ১২ পাতায়)

কংগ্রেসী সরকারের শ্রমিক নিধনের ঘৃণ্য চক্রান্ত

সম্প্রতি কিছুদিন ধরে ভারত সরকারের শ্রম নীতির মধ্যে একটা বিশেষ ঝোঁক অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে। ঝোঁকটা হচ্ছে মালিক শ্রেণীর স্বার্থে, বিশেষ করে বড় বড় একচেটিয়া সংগঠিত মালিক-গোষ্ঠীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে—মজুর শ্রেণীর স্বার্থ ও সাথে সাথে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বলি দেওয়া। অনেকে হয়ত বলবেন যে, কথাটা আর নূতন কি—কংগ্রেস সরকার ত প্রথম থেকেই মালিক-শ্রেণীর তল্পীবাহকের কাজ করে আসছে। কংগ্রেস সরকারের মূল শ্রেণী চরিত্র যে পুঁজিবাদী, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না রেখেই কিন্তু উপরিউক্ত নূতন ধারাটির কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে যে সময়ে ভারত সরকার শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বিষয়ে নানা রকমের আইন রচনা, বিভিন্ন রিপোর্ট প্রকাশ করা ও ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে শ্রম-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তি ও শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির কথা তারস্বরে ঘোষণা করে চলেছে, সে সময়েই অপর দিকে অত্যন্ত নগ্নভাবে বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে শ্রম-মালিক বিরোধ সম্পর্কে নিজেদের ঘোষিত নীতি থেকেই পিছনে সরে আসছে।

মাত্র অল্প কিছুদিন আগে ভারত সরকারের শ্রম-মন্ত্রী শ্রী গিরির পদত্যাগ থেকেই সরকারের এই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল রূপটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সরকারের শ্রম নীতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রী গিরির এই পদত্যাগ একটি লক্ষ্যনীয় ঘটনা। শুধু প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রই নয়—সরকারের শ্রম-নীতিতে বিশেষ করে এবং সাধারণভাবেই মন্ত্রী সভার ভিতরে যে সংকট দেখা দিয়েছে তাও এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। শ্রী গিরি একজন নরমপন্থী ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট এবং চিরকালই তিনি কংগ্রেসী—ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে বিপ্লবী ধারায় পরিচালনা করা বা শ্রেণী সংগ্রামের পাঠশালা হিসাবে বিচার করার দৃষ্টিভঙ্গী কোন দিনই তাঁর নয়। পুঁজিপতি সমাজের গণ্ডীর মধ্যেই শ্রমিকদের কিছুটা সামাজিক ও আইনগত ন্যায়ের সুযোগ সুবিধা দিতে চান মাত্র। অথচ এই ধরণের নরম পন্থীকেও নেহরু সরকারের মন্ত্রী সভার সাথে মত বিরোধ করতে হলো ও শেষ পর্য্যন্ত বেরিয়ে আসতে হলো।

ব্যাঙ্ক-বিরোধ সংক্রান্ত ব্যাপারেই গিরিকে পদত্যাগ করতে হলো এবং এই ব্যাপারেই ভারত সরকারের নীতি অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশ পেলো। ব্যাঙ্ক-বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়োজিত আপীল আদালতের (Appelete Tribunal) রায় সংশোধনের যে সিদ্ধান্ত ভারত সরকার গ্রহণ করেছে, তাহাতে মতভেদ হওয়াই শ্রী গিরির পদত্যাগের আশু কারণ। এই ব্যাঙ্ক-বিরোধ সম্পর্কে সরকারী নীতি দুটি জিনিষ পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে—প্রথমতঃ যত দীর্ঘ দিন সম্ভব ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের দাবী-দাওয়ার আন্দোলনকে সংগ্রামী খাতে অগ্রসর হতে না দেবার জন্য ট্রাইব্যুনালের আইনগত কচ্‌কচির মধ্যে ঠেকিয়ে রাখা। দ্বিতীয়তঃ সরকারের নিজের বসানো আপীল ট্রাইব্যুনালও যখন শ্রমিকদের স্বার্থে কিঞ্চিৎ অধিকার দিতে বাধ্য হলো তখন একচেটিয়া ব্যাঙ্ক মালিকদের ও ফিনানসিয়ার্সদের স্বার্থে সরকার সেই ট্রাইব্যুনালের রায়ও সংশোধন করে বসল। আমাদের দেশের ব্যাঙ্কগুলি মুষ্টিমেয় একচেটিয়া মালিকদের করতলগত—এই মালিক-গোষ্ঠীই আজ দেশের বড় বড় শিল্পে অর্থ নিয়োগ করছে। ভারত সরকার এই মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কতখানি ব্যগ্র তা স্পষ্ট হলো পার্লামেণ্টে অর্থমন্ত্রী দেশমুখের কুখ্যাত ঘোষণা যে, "সরকারের নিকট ৬০,০০০ হাজার ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর স্বার্থ অপেক্ষাও ব্যাঙ্ক মালিকদের ও আমানতকারীদের স্বার্থ অনেক বড় এবং সে জন্যই ট্রাইব্যুনালের রায়ের সংশোধন করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন।" মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এত নির্লজ্জ ঘোষণা ইদানিংকালে আর পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই অর্থমন্ত্রী দেশমুখ ব্রিটিশ আমলে ও তার পরেও বহুদিন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর ছিলেন এবং দেশী বিদেশী মালিক, ফিনানসিয়ার ও শিল্পপতিদের সাথে তার গভীর আঁতাত এবং ইনিই আজকাল ভারত সরকারের নীতি নির্দ্ধারণ করছেন।

নরমপন্থী গিরির মত ছিল যে, যদিও আইনগত দিক থেকে আপীল ট্রাইব্যুনালের রায় সংশোধন করার অধিকার ভারত সরকারের আছে (আপীল ট্রাইব্যুনাল আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী সরকার এই অধিকার করে রেখেছে) তথাপি শ্রমিকদের প্রতি শুধু আইনগত অধিকারই নয় বরং সামাজিক অধিকারের দিকও দেখার প্রয়োজন। নেহরু-দেশমুখ কৃষ্ণমাচারী পরিচালিত ভারত সরকার অবিশ্যি এই সামাজিক অধিকারের কথা বিবেচনা করতে পারেন না। প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, নরমপন্থী গিরি শ্রম-মন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই শ্রম-মালিক বিরোধ সম্পর্কে Collective Bargaining-এর নীতির কথাই প্রচার করে আসছিলেন। শ্রমিক ও মালিক এই দুই পক্ষের ভিতর খোলাখুলি আলোচনা দ্বারাই বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে তিনি মনে করতেন এবং এই ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ সরকারের হস্তক্ষেপ যতটা কম হয় ততই মঙ্গল বলেই তিনি বলতেন। সরাসরি আলোচনা ব্যর্থ হলে শ্রমিকদের পক্ষে ধর্ম্মঘট অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত বলেই তিনি বরাবর বলে এসেছেন। কিন্তু সংগঠিত শ্রমিকদের collective bargain এবং শিল্প-বিরোধের ক্ষেত্রে করার অধিকার দেওয়ার এই নীতি ভারত সরকার এবং বিশেষ করে মন্ত্রী মণ্ডলী কখনই মেনে নেয়নি।

বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে বিরোধ মীমাংসার জন্য সরাসরি আলোচনার স্তর ব্যর্থ হলে ট্রাইব্যুনাল বসানোর নীতিও গিরি চালু করার চেষ্টা করেছেন। ত্রিদলীয় স্থায়ী শ্রম এডভাইসরী বোর্ডও এই ধরণের নীতি স্বীকার করেছিল। কিন্তু ভারত সরকার এই নীতি শুধু সফল করতে দেয় নি তাই নয়, মন্ত্রীমণ্ডলী খোলাখুলী বিরোধীতা করেছে। যার ফলেই দেখা গেল যে ভারতীয় বীমা কর্ম্মচারীদের বিরোধ বিভিন্ন পক্ষ থেকে ট্রাইব্যুনালে দেওয়ার কথা বলা সত্বেও ভারত সরকার বীমা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইব্যুনাল বসাতে অস্বীকার করেছেন। অতীতেও দেখা গেছে যে, বার্ণপুর ইস্পাত কারখানায় '৫৩ সালের ধর্ম্মঘটের সময়ে কিংবা জামসেদপুর ইন্দ্র সিং-এর লৌহ কারখানায় ধর্ম্মঘট প্রভৃতি বিরোধ ভারত সরকার ট্রাইব্যুনালে দিতে ঘোরতরভাবে আপত্তি করেছে।

ট্রাইব্যুনালের ব্যাপারে ভারত সরকারের নীতির অসামঞ্জস্যতা আরও স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে খোদ সরকার পরিচালিত বিভিন্ন বিভাগের শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের বিরোধের ক্ষেত্রে। সরকারী বিভিন্ন বিভাগে শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের অসন্তোষ গত কয়েক বৎসরে অত্যন্ত তীব্র আকারে বেড়ে উঠেছে এবং বহু আন্দোলন ও তা নিয়ে হয়েছে ; অথচ আজ পর্য্যন্ত ভারত সরকার এই সমস্ত দাবী মেটানোর ব্যাপারে ত কিছু করেনই নি উপরন্তু এই সমস্ত বিরোধ এডজুডিকেশানের জন্য কনসিলিয়েশান বা ট্রাইব্যুনাল কিছুই বসাতে কোন মতেই রাজী হচ্ছেন না। অর্ডিনান্স কারখানার শ্রমিকদের নমুনা ধর্ম্মঘট প্রভৃতি জোরদার আন্দোলনও সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে পূর্ণ সাফল্য অর্জ্জন করতে পারেনি। কেন্দ্রীয় পূর্ত্ত বিভাগের শ্রমিকরা (C.P.W.D.) বহুদিন যাবত আন্দোলন করেও আজ পর্য্যন্ত সরকারকে ট্রাইব্যুনালের প্রশ্নে রাজী করাতে পারেনি। সরকারী কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রে সরকার Industrial Dispute Act-এ এই ট্রাইব্যুনাল-এর অধিকার দিতেও নারাজ অপর দিকে ধর্ম্মঘটের আইন গত অধিকারও এদের ক্ষেত্রে হরণ করার ... বিশেষ ভাবে ব্যগ্র। কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে যারাই জড়িত তারা ভাল ভাবেই জানেন যে, যে কোন সরকারী বিভাগের বিরোধ নিষ্পত্তির প্রশ্নে মন্ত্রী মণ্ডলী কি মনোভাব প্রদর্শন করেন। সাথে সাথেই গত কিছু কাল ধরে সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর আক্রমণ ও তাদের সংগঠনের অধিকারের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণ এ অভিজ্ঞতাও আজ সরকারী শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের ভাল ভাবেই হয়েছে। আরও দেখা গেছে যে, ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের শ্রমিকও কর্ম্মচারীদের দাবী বা বিরোধ মীমাংসার জন্য শ্রম-দপ্তর হস্তক্ষেপের অত্যন্ত মৃদু চেষ্টা করলেও তাকে সংশ্লিষ্ট সরকারী মন্ত্রী দপ্তর থেকে সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ওসব বিষয়ে নাক গলানো চলবে না।

ভারত সরকারের ঘোষিত শ্রম-নীতি ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাস্তব কাজে আর একটি কৌতুকপ্রদ অসামঞ্জস্যতা উল্লেখযোগ্য। বড় বড় একচেটিয়া মালিকদের অধীনস্থ বিশেষ বিশেষ কোন শিল্পের বা কারখানার কোন বিরোধ উপলক্ষ্যে সংগঠিত শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সরকারী শ্রম দপ্তরের সাহায্য প্রার্থনা করলে, প্রায়শঃই শ্রম দপ্তর

ছাঁটাই, বেকারী, র‍্যাশনালাইজেশন ও শ্রমিকের আইনগত অধিকার হরণই

কংগ্রেসী শ্রমনীতির প্রকৃত বাহন

নিতান্ত অসহায় ভাবে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেন যে, 'অমুক মালিককে কোন কথা শোনান যায় না' বা 'অমুক মালিক বড় একগুঁয়ে' আমাদের গ্রাহ্যই করে না' ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রম-দপ্তরের এই অসহায় অক্ষমতার কারণ যে কি তা বোধ করি আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। লালা শ্রীরাম, বিড়লা বা টাটারা যখন শ্রম-আইন উপেক্ষা করেন বা শ্রমিকদের দাবী দাওয়া ও অধিকার জবরদস্তি ভাবে হরণ করেন তখন সরকারী শ্রম-দপ্তর শুধু অসহায় অক্ষমতাই প্রকাশ করেন কেন না ঐ মালিক গোষ্ঠী খোদ ভারত সরকারকে প্রায় হুমকি দিয়ে পরিচালনা করছেন।

পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা বা কম্যুনিটি প্রোজেক্টের অধীনে কোন কোন গঠন মুলক কাজে যখন নগ্ন ভাবে শ্রমিক শোষণ ও নিপীড়ন চলছে তখন সেখানকার শ্রমিকেরা নিজেদের চাকুরির অবস্থা অত্যন্ত অস্থায়ী জেনেও শোষণের বিরুদ্ধে নিরুপায় হয়ে মাঝে মাঝে ধর্ম্মঘট বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ অবলম্বন করেছেন। যেমন দামোদর উপত্যকা করপোরেশানের (D.V.C.) অধীনস্ত শ্রমিকেরা গত '৫৩ সালে বোখারো থার্ম্মাল পাওয়ার ষ্টেশনে, পাঞ্চেত বাঁধ-এ এবং দুর্গাপুরে একাধিক-বার ধর্ম্মঘটের পথে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এসব বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সরকারী মনোভাব যে কতটা প্রতিক্রিয়াশীল তা উক্ত ইউনিয়ন সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। উচ্চতম সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার কথা শুনতেই অস্বীকার করেন এই যুক্তিতে যে, 'রাষ্ট্রের গঠন মুলক কাজে শুধু ত্যাগ স্বীকারই করতে হবে দাবী দাওয়ার কথা আবার কেন?' সরকারী শ্রম দপ্তর পরিষ্কার ঐ সব বিরোধে কিছুই করবার নেই ঘোষণা করেন।

বড় বড় মালিকদের স্বার্থে সরকারী শ্রম-নীতি চালিত করার বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৯৫২ সালের মধ্য ভাগে চা-বাগানের মালিকেরা যখন চা-শিল্পে সঙ্কটের নামে রপ্তানী শুল্ক উঠিয়ে দেবার দাবী জানান তখন ভারত সরকার এই বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। শ্রমিকদের তরফ থেকে দাবী উঠে যে তদন্ত কমিটিতে চা-বাগানের শ্রমি[illegible]দের বক্তব্য শুনতে হবে এবং শ্রমিকদের অজ্ঞাতসারে তাদের বেতন বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া চলবে না। এই দাবীর জবাবে পার্লামেণ্টে শ্রী দেশমুখ ও কৃষ্ণমাচারী উভয়েই স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, তদন্ত কমিটির কাজ খুবই সীমাবদ্ধ এবং (১) মজুরি ইত্যাদি নিয়ে তদন্ত বা সুপারিশ করার প্রশ্ন উঠে না। (২) দ্বিতীয়তঃ শ্রমিকেরা বর্ত্তমানে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে তার উপর কোন হস্তক্ষেপ হবে না।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেছে যে তদন্ত কমিটি শ্রমিকদের পকেট কাটারই সুপারিশ করেছে এবং ভারত সরকার ও সেই সুপারিশ মেনে নিয়েছে। এই ক্ষেত্রে চা-বাগানের দেশী ও বিদেশী মালিকরা যে ভারত সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা অভিজ্ঞ মহল জানেন।

শ্রমিক কর্ম্মচারীদের ব্যাপক ভাবে ছাঁটাই করা প্রায় '৫০—৫১ সাল থেকেই সুরু হয়েছে। বড় বড় শিল্পের মধ্যে সুতাকল, চটকল, চা-বাগিচা, খনি শিল্পে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে প্রভৃতিতে ব্যাপক ভাবে ছাটাই নীতি চালু হয়েছে —খোদ সরকারী দপ্তরগুলীতেও ব্যাপক ভাবে শ্রমিক কর্ম্মচারী গত কয়েক বৎসর ছাঁটাই হয়ে গেছে। এই ব্যাপক ছাঁটাই এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শিল্পে স্থানীয় ভাবে ও সারা দেশব্যাপী ও বহু প্রতি-বাদ আন্দোলন হয়েছে এবং অনেক ধর্ম্মঘট ও অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারত সরকার দেশের বেকারী সংকটের অবসানের কথা মৌখিকভাবে বহু বার ঘোষণা করেছে কিন্তু এই ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই সম্পর্কে বহুদিন নীরব থেকে গেছে। '৫২ সালের শেষ ভাগে এমন ঘোষণা পর্য্যন্ত হয়েছিল যে শুধু-মাত্র ছাঁটাই সমস্যাকে ভিত্তি করে যে বিরোধ তা ট্রাইবুনালে দেওয়া হবে না। যাই হোক্ শেষ পর্য্যন্ত বহু আন্দোলন ও প্রতিবাদের ফলে ১৯৫৩ সালে সরকার সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ চাপের কাছে সামান্য নতি স্বীকার করে ও শিল্প বিরোধ আইনের (Industrial Dispute Act) সংশোধন করে ছাঁটাই ও লে-অফ শ্রমিকদের কিছুটা ক্ষতি পূরণ দেবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে ঐ সামান্য অধিকারটুকুও শ্রমিকদের দিতে মালিকরা নারাজ—এবং এই সংশোধিত আইনকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানা ভাবে উপেক্ষা করে শেষ পর্য্যন্ত আইনকেই বিকৃত করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করছে। সে সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শ্রম-দপ্তর নিজেদের অক্ষমতা জাহির করে দায়িত্ব এড়িয়ে যায়।

শ্রমিকদের অধিকার হরণের আরও মারাত্মক নমুনা হচ্ছে সম্প্রতি মালিকদের চাপে শিল্প-বিরোধ আইনের ৩৩নং ধারাকে উঠিয়ে দেবার ব্যাপারে সরকারের সম্মতি দান। এই ৩৩নং ধারা বলে, কোন শিল্পের বা কারখানার শ্রমিক মালিক বিরোধ যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইবুনালে থাকে ট্রাই-বুনালের অনুমতি ব্যতীত মালিক শ্রমিকদের চাকুরির সর্ত্ত বা অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে পারে না—মানে ছাঁটাই, মজুরি হ্রাস ইত্যাদি করতে পারে না। কিন্তু মালিকদের এই আবদার কার্য্যে পরিণত হলে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার মারাত্মক অসুবিধা সৃষ্টি হ'বে।

শ্রমিক ছাঁটাই ব্যাপারে শ্রমিকদের সমস্ত মহল থেকে বিরাট বাধা পেয়ে মালিক শ্রেণী নূতন আব্দার ধরল—র‍্যাশনেলাইজেশান করবে। আসলে যন্ত্রের উন্নতির নামে শ্রমিক ছাঁটাই করবে ও অল্প লোক দিয়ে বেশী কাজ করাবে। এই নূতন ষড়যন্ত্র সম্বন্ধেও শ্রমিকদের সমস্ত সংগঠন থেকে প্রবল আপত্তি উঠল। এমন কি যে ইণ্টক (INTUC) '৪৭ সাল থেকেই সরকারী শ্রমনীতির সাফাই গেয়ে আসছে এবং যারা শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে কংগ্রেসের হাতিয়ার তারা পর্য্যন্ত ছাঁটাই এর মৌখিক বিরোধিতা ও রেশনালাইজে-শানের বিরুদ্ধে মৃদু আপত্তি তুলল। কিন্তু মালিকদের চাপ ও ইঙ্গিতই বড় হলো; এক্ষেত্রে সরকার মালিকের আব্দারই মেনে নিল ও পার্লামেণ্টে প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা করেও রেশনালাইজেশান নীতি গ্রহণ করল। সরকার বর্ত্তমানে প্রাথমিক ধাপ হিসাবে বোম্বাই ও কাণপুরের বস্ত্রশিল্পে ও ইঞ্জি-নিয়ারিং শিল্পে রেশনালাইজেশান চালু করার নীতি গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, ইণ্টকেরও (INTUC) কোন কোন সভ্য পার্লামেণ্টে ইহার তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং উত্তর প্রদেশের জনৈক কংগ্রেসী এম পি এর প্রতিবাদ স্বরূপ শুধু কংগ্রেস থেকে পদত্যাগই করেনি, পার্লামেণ্ট থেকে ও সদস্যপদ ত্যাগ করে আবার উপ-নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এই সব ঘটনা এই সত্যই প্রমাণ করে যে দুর্নীতি ও মালিক তোষণ এমন প্রবলভাবে সরকারী মহলে চালু হয়েছে যে কংগ্রেসী

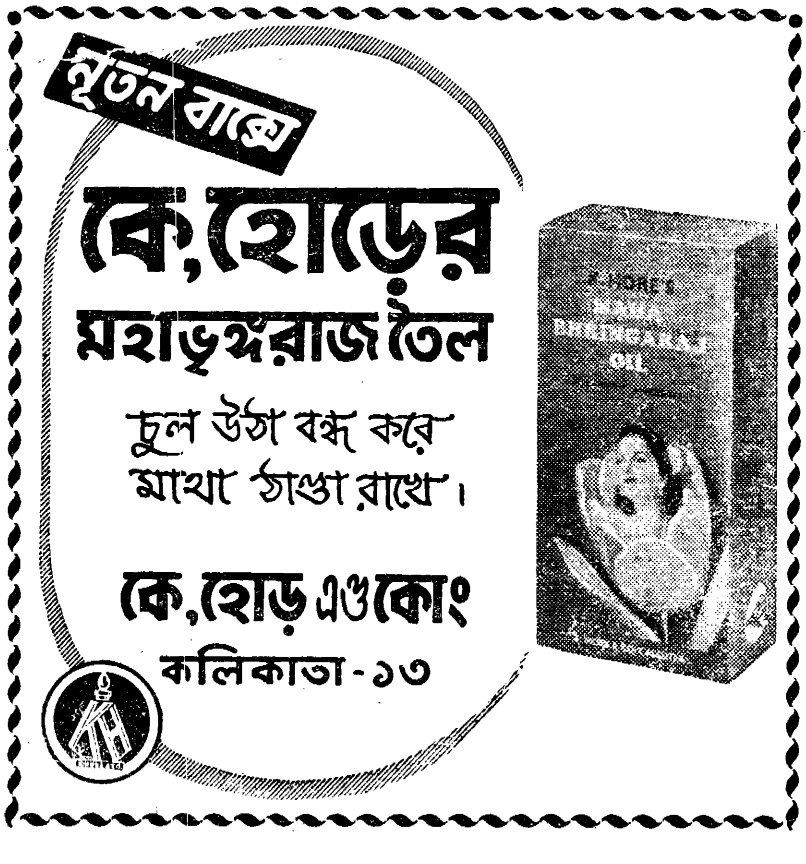

ভারত সরকারের শ্রমনীতি

শক্তির মধ্যেও ঐক্যবদ্ধতা রক্ষা করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

এই সমস্ত ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় তা সংক্ষেপে এই দাড়ায় যে (১) গত বিশ্ব-যুদ্ধের অবসানের সাথে সাথেই যে অর্থ-নৈতিক সংকট দুনিয়াব্যাপী সুরু হয়েছে এবং তার পরিপূরক হিসাবে ভারতীয় অর্থনীতিতেও যে সংকট দেখা গেছে তার সমস্ত বোঝা মালিক শ্রেণী শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের মুনাফার পাহাড় ঠিক রাখতে চায়। (২) যুদ্ধোত্তর যুগে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের চাপে জাতীয় পুঁজিপতি সরবার শ্রমিকদের কিঞ্চিৎ আইনগত অধিকার দিতে বাধ্য হয়েছিল যার ফলে '৪৭ সাল থেকে কিছু কিছু আংশিক-শ্রমিক স্বার্থ সম্পন্ন-আইন রচিত হয়েছিল। অবিশ্যি গোটা টি, ইউ, আন্দোলনকে একমাত্র আইনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার উদ্দেশ্যে এই সব আইন রচিত হয়েছে। (৩) কিন্তু একচেটিয়া ও গোষ্টিবদ্ধ মালিকদের চাপে ধারে ধারে সেই সব অধিকারগুলি আবার হরণ করতে সুরু করেছে। ১৯৫২ সালের কোরিয়া যুদ্ধের বিরতির পর থেকে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে মন্দা এসেছে ও ভারতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির যে সংকট ক্রমশঃ তীব্র হচ্ছে তার পরি-প্রেক্ষিতে প্রশ্নটিকে বিচার করলে বুঝতে সুবিধা হয়। সংকট ত্রাণের পথ হিসাবে দেশী ও বিদেশী মালিক শ্রেণী নিজেদের মুনাফার পরিমাণ অক্ষুন্ন রাখার জন্য শ্রমিকদের ন্যূনতম অধিকার ও সুবিধা গুলি ছিনিয়ে নিতে চায়। ভারত সরকারের মালিক তোষণ নীতি এই আক্রমণের সমর্থনে খোলাখুলি এসে দাঁড়াচ্ছে। ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল দেশমুখ—কৃষ্ণমাচারী চক্রের তথা নেহেরু সরকারের সাম্প্রতিক কার্য্যকলাপ এই নীতিরই স্বাক্ষর বহন করছে।

(৪) কিন্তু গণতান্ত্রিক ও লোকায়ত্ত সরকার বলে নিজেদের জাহির করতে হলে শ্রম-মালিক বিরোধ ব্যাপারে নিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়ের বুলি কপচাতে হয়; কিন্তু এই বুলির আবরণের পেছনে মালিক তোষণের বীভৎস রূপ নির্লজ্জভাবে উঁকি মারছে।

বিশেষ করে শ্রমিক কল্যাণ, সামাজিক ন্যায়, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র, জাতির গঠন ও উৎপাদনের স্বার্থে শিল্পে শান্তি, আইন সম্মত পথে শ্রম-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তি প্রভৃতি আওয়াজের বাস্তবতা প্রমাণের জন্য শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের যে টুকু সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং মুখোস এতদিন রাখা সম্ভব হয়েছে শ্রমিকদের উপর মালিক শ্রেণীর আক্রমণ ও সরকারের উপর চাপের ফলে সেটুকুও আজ কংগ্রেস সরকারের পক্ষে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ভারত সরকারের শ্রম-নীতির নূতন ঝোঁক এই খানেই। শ্রমিকদের বহুদিনের সংগ্রামে অর্জিত ন্যূনতম অধিকারগুলিও হরণ করে কোন সরকারই নিজেকে লোকায়ত্ত সরকার বলে পরিচয় দিতে পারে না।

(৫) নরমপন্থী গিরির পদত্যাগ এমন কি ভারত সরকারের চীফ লেবার কমিশনার শ্রীযোশীর পদত্যাগ (সরকারী শ্রম দপ্তরের অসহায় অক্ষমতার নিদর্শন) কংগ্রেসী ও ইণ্টক (INTUC) মহলে মত বিরোধ ইত্যাদি ঘটনা হতে বোঝা যায় যে, ভারত সরকারের শ্রম নীতি এরূপ নির্লজ্জভাবে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে যে দু চার জন ঝানু কংগ্রেসী নেতাও তার সমর্থন করতে পারছে না। এবং সেই কারণে কংগ্রেসীদের মধ্যে ও আগেকার সে অটুট ঐক্যবদ্ধতা আর রক্ষা করা যাচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, পদত্যাগকারী মন্ত্রী বা অফিসার তাঁদের পদত্যাগ কার্য্যটির দ্বারা রাতারাতি প্রগতিশীল ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার সাচ্চা সৈনিক হয়ে যান নি। শ্রীগিরির পদত্যাগ এই দৃষ্টিতেই দেখতে হবে। মালিক শ্রেণীর এই আক্রমণ ও ভারত সরকারের মালিক তোষণের নির্লজ্জ শ্রম নীতির বিরুদ্ধে তাই আজ শ্রমিক শ্রেণীকে অধিকার রক্ষা ও বাঁচার পথকে প্রশস্ত করার জন্য সংঘবদ্ধ বলিষ্ঠ আন্দোলন করার পথেই এগোতে হবে। সরকারী নীতি সম্বন্ধে বা নেহেরু সম্বন্ধে আজও যাদের ক্ষণিক মোহ আছে তাদের এই সত্য পরিস্কার উপলব্ধি করতে হবে সমস্ত শিল্পের সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর সামনে আজ পরিস্কার সত্য এই যে একমাত্র ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শক্তিতেই সরকার মালিক যুগপৎ আক্রমণকে পরাজিত করা সম্ভব। ঐক্য আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। নিরাশা বা অবিশ্বাস শ্রমিকের পক্ষে আজ সবচেয়ে বড় দুষমণ।

সাংবাদিক সম্মেলনে

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগ বর্ণনা

দাবী পূরণ না হলে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হবার ইঙ্গিত

গত ২৭শে অক্টোবর কলিকাতাস্থিত মেট্রোপোল হোটেলে "খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর কর্মচারী সমিতি"র সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিকদের নিকট উক্ত দপ্তরের কর্মীদের অভাব অভিযোগ সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে খাদ্য বিনিয়ন্ত্রণের বহু পূর্বেই কর্মচারী সমিতি সরকারের নিকট তাহাদের বিকল্প চাকুরীর ব্যবস্থা সম্পর্কে যে গঠনমূলক প্রস্তাব পেশ করিয়াছে তাহাকে সরকার কোন গুরুত্বই দেয় নাই। বর্তমানে বিনিয়ন্ত্রণের ফলে যে অবস্থা উদ্ভূত হইয়াছে তাহার দায়িত্বও সরকার সরাসরি অস্বীকার করিতেছে। তিনি অভিযোগ করেন যে সরকারী কর্তৃপক্ষ জনসাধারণ ও বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে [illegible] ব[illegible]ম বিবৃতি দিয়াছেন— [illegible] তাঁর কাজে পরিণত করা হয় নাই। আশ্বাস এবং কাজের ভিতর সরকারী কর্তৃপক্ষের কোথায় কোথায় পার্থক্য বা গলদ দেখা গেছে তার সমস্ত নিদর্শন উল্লেখ করেন। যথা (১) সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রচারিত বক্তব্য যে খাদ্য দপ্তরের কর্মচারীদের বিকল্প চাকুরী দিবার ব্যাপারে তাহাদের নিজস্ব পরিকল্পনা (Scheme) আছে এবং সেইজন্য কর্মচারীদের বাইরে কোন স্থানের চাকুরী গ্রহণ করার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পথকে সম্পূর্ণরূপ বন্ধ করা হইলেও সেই পরিকল্পনা আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত মোট ১৮ হাজার কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ৪হাজার কর্মচারীকে এই বিকল্প চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। (২) এই দপ্তরের আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও ছাঁটাই করা হয় নাই এই বক্তব্যেও সত্যের অপলাপ ঘটিয়াছে। যেহেতু ১৯৫৩ সালের জুন মাসে ৩৬৭ জন মজুরকে ছাঁটাই করা হইয়াছিল যদিও ইহার মধ্যে ৮০ জন পুনরায় বহাল হইয়াছে। তাহাছাড়া ১৯৫৪ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখেও অনুরূপ ১৫ জনকে ছাঁটাই করা হইয়াছে।

(৩) যাহাদের অন্যত্র চাকুরী দেওয়া হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে পূর্বের আশ্বাস অনুযায়ী "Continuity and Security of Service"কে বজায় রাখা হয় নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তুল্যমান বেতনের (Comparable rate of pay) ব্যাপারেও একই ধরণের বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে।

(৪) পণ্ডিত নেহরু যদিও এক বিবৃতিতে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ রেলওয়ে, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ প্রভৃতি দপ্তরে চাকুরী দিবার কথা বিচার করা হইবে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত অনুরূপ কিছুই ঘটে নাই।

এই ধরণের অভাব অভিযোগের ও দাবী দাওয়া সম্বলিত এক স্মারকলিপি মুখ্য মন্ত্রী বিধান রায়ের নিকট পাঠান হইয়াছে যাহাতে তাঁহার সহিত ডেপুটেশনে সাক্ষাৎ করিবার দাবীও উল্লিখিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ৩১শে অক্টোবর সমস্ত রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ান নেতৃবৃন্দকে লইয়া এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে যেখানে কর্মচারী সমিতি তাহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করিবে।

দাশ এণ্ড কোং

এখানে ইট, সুরকী, বালি, রং, ইত্যাদি যাবতীয় ইমারতী মাল মসল্লা পাইকারী ও খুচরা সুলভে বিক্রয় হয়।

মোল্লার হাট, বি, টি, রোড, ২৪ পরগণা।

কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের প্রতি পণ্ডিত নেহরুর বিষোদ্গার

(৮-এর পাতার পর)

ও বাহবা পাওয়ার রাস্তাও খোলা রইল। এই প্রস্তাবের মূলকথা প্রথমে যুদ্ধ বিরতি, অতঃপর সোভিয়েট, চীন, ব্রিটেন ও আমেরিকা এই চারটী দেশের মধ্যে এমন এক চুক্তি সম্পাদন করা যাতে কেউই না ইন্দোচীনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু ইন্দোচীনের মাটী থেকে ফরাসী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যকে পুরোপুরি ভাবে সরতে হবে কিনা সে সম্পর্কে একটি কথাও হ'ল না। তাছাড়া ব্রিটেন আমেরিকার সংগে চীন ও সোভিয়েটের এমন এক অদ্ভুত চুক্তি করতে বলা হ'ল যার থেকে বোঝায় যে এই চারজনই বুঝি ইন্দোচীনের যুদ্ধের জন্য সমভাবে দায়ী অথবা এই চারজনের কাছ থেকে ইন্দোচীন নূতন করে আক্রান্ত হ'তে পারে! কি সুন্দর ব্যবস্থা!

আসলে নেহেরু শান্তিনীতির মূলকথা বিশ্বশান্তি আন্দোলনকে শক্তিশালী করা নয় বরং কোন না কোন প্রকারে প্রমান করা যে পৃথিবীতে আজ দুইটি শক্তির শিবির এবং দুই শিবিরই যুদ্ধ বাঁধাতে চায়। এর মধ্যে ভারতবর্ষের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে তৃতীয় শিবির। কাজেই নেহেরুর শান্তি নীতি শান্তি শিবিরের স্বার্থরক্ষার জন্য নয় এই তৃতীয় শিবিরকেই শক্তিশালী করার জন্য, একথা আজ তার সমস্ত কাজের দ্বারাই প্রমান হচ্ছে। চীন যাত্রার প্রাক্কালে গত ২৯ শে সেপ্টেম্বর নেহেরুজী লোক সভায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ভারতের বৈদেশিক নীতির উপর যে বিরাট বক্তৃতা দিয়েছেন তাতেও এই মনোভাব সুস্পষ্ট। ম্যানিলা চুক্তি সম্পর্কে নেহরুজী বলেছেন যে ম্যানিলা চুক্তি ও SEATO কমিউনিষ্ট দেশগুলির ভয়েই জন্ম নিয়েছে (অর্থাৎ কমিউনিষ্ট দেশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মনোভাব থেকে নয়) কমিউনিষ্ট দেশগুলি এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে নেহরুজীর মত হল "If there was such a thing as a communist party in a country i.e a national communist party (ন্যাশ্নাল সোস্যালিষ্ট; নয় কেন!) that is a party which has nothing to do with another country, that is a different matter.

The difficulty comes in because that party in your country is intellectually, and otherwise tied up, with other groups in another country and the other country might well utilise that for its advantage. (cheers from congress benches) That is the fear that comes to all these south eastern countries and others, whether it is Burma, Thailand or any other country with the result unfortunately, that problems which could be considered by themselves get tied up with these extraneous issues and different types of reactions are created. (Hindusthan Standard Sept.30, '54) অর্থাৎ নেহরুজী বলতে চান কমিউনিষ্ট পার্টি কর ক্ষতি নেই কিন্তু আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সংগে যোগ রেখনা। জাতীয় কমিউ- পার্টি গড়ে তোল.

(অথাৎ পণ্ডিতজী যার বাখ দেখছেন) পণ্ডিতজী মিথ্যা বলেন নি। সত্যিই এই ভয়েই ত' আজ বার্মা, থাইলাণ্ড, ও দঃ পূঃ এশিয়ার পুঁজিবাদী ও সামন্ত ও তান্ত্রিক দেশগুলির শাসক সম্প্রদায় ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ চক্রান্তে যোগ দিচ্ছে।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নেহরুস্তাবক নেতৃবৃন্দকে আমরা জিজ্ঞাসা করি নেহরু সরকার কি তবুও শান্তিবাদী, তবুও কি তার এক বিরাট প্রগতিশীল ভূমিকা দেখা যাচ্ছে? যদি দেখা যায়, তবে ধন্যবাদ, আপনারা বরং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দায় মুক্ত হ'য়ে এই প্রগতিশীল ব্যক্তিটীর যাতে আরও উন্নতি হয় তারই চেষ্টা করুন! আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন সম্বন্ধেও পণ্ডিত নেহরু এক বিশেষজ্ঞের মত মন্তব্য করেছেন—"In the old days there was the Commintern that international Communist organisation which was wound up sometime during the last war. Later came the Comminform, which was, I suppose, something of the old type in a different garb. I think that these organisations and the activities that grow for the idea have **Cetainly caused a good deal of apprehension and disturbance in various countries and nations."** (emphasis ours) (Hindusthsn Standard Sept. 30, '54)

এইটেই হল আসল মনোভাব।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খারাপ হ'লেও হ'তে পারে কিন্তু কমিউনিষ্টরা আরও ভয়ানক, বিশেষ ক'রে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন 'কমিনফরম'। আর তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই ত' বার্মা, থাইল্যাণ্ড, দঃ পূঃ এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং পণ্ডিত নেহরু নিজেও ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজদের ডানার তলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন—তাই নয় কি? আমাদের অনুমান যে মিথ্যা নয় তা' প্রমান করে দিয়েছেন ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের বিখ্যাত কাগজ ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান। 'Nehru a leading statesman এই শিরোণামায় গত ২রা অক্টোবর Manchester Guardian এক সম্পাদকীয় কলমে লিখেছেন--"He (Mr. Nehru) has received the Indonesian Prime Minister in D[illegible] he will soon be going to China. He has taken badly the setting up of the SEATO organisation. He does not need to object to it because of the actual military terms of the agreement—since these are very vague, and he recognises as he showed in his speech on Wednesday, that the free countries have grounds for fear from the acts of Cominform."

কিন্তু নেহরু সরকার নির্বোধ নয়। নেহরু সরকার জানে যে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের স্বার্থদ্বন্দ্বে কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া তার পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক। বিশ্বজুড়ে ডলার ষ্টার্লিং দ্বন্দ্বে নেহরু সরকার ষ্টার্লিং-এর পক্ষে। আবার কমনওয়েল্থের নিজস্ব অন্তর্বিরোধের ক্ষেত্রে নেহরু সরকার টাকার পক্ষে এবং ষ্টার্লিং-এর বিরুদ্ধে। ভারতের দেশী পুঁজিপতিরা আজ কমনওয়েলথের অন্যান্য রাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের তুলনায় বহুগুণে শক্তিশালী এবং ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হ'বার আশা রাখে। কাজেই একদিকে ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে অপরদিকে কমনওয়েলথ ভুক্ত অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সংগেও ভারতের পুঁজির স্বার্থের বিরোধ। কাজেই পাকিস্তানের সংগে নেহরু সরকারের ঝগড়া সিংহলের সংগে বনিবনার অভাব এবং আন্তর্জাতিক সমস্যায় অনেক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের সংগেও মত বিরোধ। সোভিয়েট ও চীনের সংগে নেহরুজীর বন্ধুত্ব তাকে এই সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় পুঁজিবাদের প্রতিদ্বন্দ্বি দেশগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করতে বা চাপ দিতে যথেষ্ট সহায়তা করছে। এক কথায় ভারতের পুঁজিবাদ আজ সারা এশিয়ার বাজারে বাণিজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখছে কাজেই একদিকে যেমন সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের সংগেই তার প্রতিযোগিতা অন্যদিকে তেমনি এশিয়ার কমনওয়েলথ ভুক্ত এবং অন্যান্য ছোট পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোকে একত্র ক'রে এক স্বতন্ত্র জোটের নেতৃত্ব করারও তার ইচ্ছা। কলম্বো শক্তিগুলির নেতা হিসাবে ভারতবর্ষ আজ সারা এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। কাজেই খামাকা SEATO-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজের শান্তিবাদী সুনাম, নেতৃত্বের সুনাম এক ভবিষ্যতের এই বিরাট সম্ভাবনা নষ্ট করা এবং মার্কিণ যুদ্ধ চক্রান্তের দায়িত্ব স্কন্ধে নেওয়ার মধ্যে ভারতবর্ষ কোন লাভের আসা দেখেনা। সেইজন্যই মার্কিণ সামরিক চুক্তিতেই নেহরুজীর আপত্তি। ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণীর আশা আকাংখাই নেহরু সরকারের বৈদেশিক নীতির নির্ধারক। ভারতের দেশী পুঁজিপতি শ্রেণী গত ২৫ বৎসরের মধ্যে অতি দ্রুত গতিতে তার পুঁজির প্রসার ঘটিয়েছে—এবং আজ সারা এশিয়ার বাজার জুড়ে বাণিজ্য করার স্বপ্ন দেখছে। এ সম্পর্কে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবাংলা শাখা থেকে প্রকাশিত "তথ্য-সঞ্চয়ণের" হিসাবই (পরের পাতায়) উদ্ধৃত করা হ'ল।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ভারতীয় দেশীয় পুঁজিবাদের দ্রুত প্রসার ঘটেছে। বিশেষ করে গত মহাযুদ্ধের মধ্যে দেশী পুঁজিপতিরা একচেটিয়া মজুতদারীর ব্যবসা ক'রে দেশী মুনাফার পাহাড় জমা করেছিল। যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের কাছে এদেশের মহাজনদের পাওনা হয়েছিল ৩০০ কোটী ষ্টার্লিং। সেদিক থেকে সিংহল ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ ততটা অগ্রসর হ'তে পারেনি। যুদ্ধের আওতা থেকে দূরে সরে অথচ যুদ্ধের চড়া বাজারের সুযোগ নিয়ে প্রচুর মুনাফা শিকার করার সেই নেশা ভারতের পুঁজিপতিদের পেয়ে বসেছে।

ভারতে পুঁজিবাদের প্রসার অকিঞ্চিৎকর নয়

(ব্রিটিশ)		
ম্যানেজিং এজেন্সী	অধীনস্থ কোম্পানী	
	১৯৩৯	১৯৪৮
২৪	৬৩৮	৬৪২

(ভারতীয়)			
ম্যানেজিং এজেন্সী		অধীনস্থ কোম্পানী	
নাম	সংখ্যা	১৯৩৯	১৯৪৮
মাড়োয়ারী	৯	৭০	২৪০
পাঞ্জাবী	২	১৮	৫০
বাঙালী	৩	১৫	৩১
বিহারী	১	৪	৫
অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	১	৩২	
মোট—	১৭	১৩৯	৩৫৮

আবার উন্নত ধরণের পুঁজিবাদী শিল্প ব্যবস্থা ও ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী উৎপাদনের সঙ্কট আজ এদেশের পুঁজিপতিদের বাধ্য করেছে এশিয়া ও অন্যান্য দেশের বাজারের দিকে হাত বাড়াতো কাজেই পশ্চিমের শক্তিগুলির সংগে ভারতীয় পুজিবাদের প্রতিযোগিতা আজ অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য ইঙ্গ-মার্কিণ একচেটিয়া পুজিকে হটিয়ে এশিয়ার বাজারে একচেটিয়া বাণিজ্য করার এই স্বপ্ন কোনদিন সফল হবে কি না বলা শক্ত কিন্তু এতটুকু অন্ততঃ নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে এই বিরোধে ভারতীয় পুজিবাদ এতটা দুর্বল না হয়ে যদি ব্রিটিশ পুঁজিরও সমকক্ষ হ'ত এবং নেহরুজীর হাতে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সংগে পাল্লা দেওয়ার মত একটি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী মজুত থাকত তাহলে ব্রিটেন বা আমেরিকার সংগে এই ব্যবসার প্রতিযোগিতা নূতন এক পুজিবাদী যুদ্ধের রূপ নিত এবং আজকের শান্তিবাদী নেতা নেহরুজী সেদিন 'এশিয়ার হিটলারের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। আমাদের সৌভাগ্য (এবং কোন কোন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের দুর্ভাগ্য) নেহরুজীর পুজি বা সৈন্যবাহিনী আন্তর্জাতিক দরকষাকষির পক্ষে এখনও ততটা শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু ভারতের পুঁজিপতিদের প্রভাব প্রতিপত্তি আজ সারা এশিয়ার বাজারে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। ভারত থেকে দঃ পূঃ এশিয়া ও আফ্রিকার বাজারে মাল রপ্তানীর পরিমাণ গত কয়েক বৎসরে যথেষ্ট বেড়েছে এবং খাস ব্রিটেনেও আগের থেকে যথেষ্ট বেশী পরিমাণে রপ্তানী বাণিজ্য চলেছে। একদিন ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় বিলাসিতা করত বলে অভিযোগ উঠত যে দেশে হাজার হাজার মানুষ অর্ধনগ্ন সেখানে বিলাতী কাপড় কিনে এরা দেশের অর্থ বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আজ বোম্বাই থেকে ম্যাঞ্চেষ্টারে সুতা ও কাপড় রপ্তানী হচ্ছে এবং বিদেশের অর্থ দেশে আসছে তবু হাজার হাজার ভারতবাসীর অর্ধনগ্নতা ঘোচেনি। টাটার ইস্পাত শিল্প সারা ভারতের বাজারেও বাণিজ্য বিস্তার করেছে। বিড়লাজীর ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপিত হয়েছে দঃ পূঃ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। অবশ্য টাটা বিড়লা গোষ্ঠী এত অল্পেই সন্তুষ্ট নন, তাঁদের আকাংখা বিশ্বগ্রাসী। কিন্তু পুরোপুরি মার্কিণ ও ব্রিটিশ পুজির তাঁবেদারীতে চললে এই আকাংখা মিটবার কোন আশা নেই। মার্কিণ যুদ্ধায়োজনে সরাসরি জড়িয়ে পড়েও তাঁদের কোন লাভ নেই বরং ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কারণ আমেরিকার নেতৃত্বে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে (কোরিয়ায়, ইন্দোচীন) যে সমস্ত যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে সেগুলি থেকে লাভের কানাকড়িও অন্য কোন পুঁজিবাদী দেশের ভাগে পড়েনি। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ যদি সম্পূর্ণ বিজয়ীও হ'ত তাহলেও সম্পূর্ণ লাভের অংশ গ্রাস করে বসত সে একলাই। সুতরাং মার্কিণ শাসক গোষ্ঠীর সরাসরি তাঁবেদার হয়ে যুদ্ধ করতে ভারতের পুঁজিপতিরা অনিচ্ছুক। তাছাড়া যুদ্ধের ঝুঁকিও অনেক। যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য ইঙ্গ-মার্কিণ গোষ্ঠির তাঁবেদারী করতে হ'লে ভারতের বাজারে আজই ইঙ্গ-মার্কিণ পুঁজির দ্রুত অনুপ্রবেশ ঘটবে, ফলে এদেশের পুঁজিপতিদের স্বাধীন ভাবে মুনাফা করার সুযোগ হারাতে হবে সারা এশিয়ায় বাণিজ্য বিস্তার করার আশাও চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের ক্ষতির একাংশ ভারতের পুজিপতিদের ঘাড়েও পড়বে। কলকারখানা ধ্বংস হবে, চাষবাস নষ্ট হবে, উৎপাদন বন্ধ হবে এবং সর্বোপরি যুদ্ধের বিরাট ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে অধিকতর অর্থনৈতিক সংকটের জালে গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়বারও সম্ভাবনা রয়েছে। তৃতীয়তঃ যুদ্ধ চাই বললেই আজ আর কোন দেশকে যুদ্ধে নামান যায় না। পৃথিবীর দেশে দেশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গড়ে উঠেছে। ভারতের পুঁজিপতিরা যদি সোজাসুজি যুদ্ধে যোগ দিতে চায় ত' আজই দেশের জনসাধারণের প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হ'বার সম্ভাবনাও আছে। কাজেই যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রাথমিক কাজ হিসাবে ব্যাপক প্রচার কার্য্য চালাতে হবে এবং তা করতে গেলেই জনতার প্রত্যেকটী দাবী দাওয়ার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ বিরোধী শান্তি আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করবে, যার পরিণাম সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে আজও কিছু বলা যায় না। এতসব ঝঞ্ঝাট নিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে নামলেও ভারতের পুজিবাদীদের আজই কিছু প্রত্যক্ষ লাভের সম্ভাবনা নেই। কাজেই ভারতীয় পুঁজিবাদীদের শান্তিপ্রিয় হ'তে হয়, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দরকার হয়, এমনকি সোভিয়েটের ও চীনের সংগে বাণিজ্য-সম্পর্ক রাখারও প্রয়োজন হয়। কিন্তু পুঁজির উন্নতির স্বার্থেই এই শান্তির প্রয়োজন, পুঁজির উচ্ছেদের স্বার্থে নয়, কাজেই শান্তির শিবিরের স্বার্থে নেহরুজীর শান্তি-নীতি নয়।

মার্কিন বিরোধীতার উদ্দেশ্যে চীন-সোভিয়েটের নেহরুকে সমর্থনের দ্বারা
ভারতের মেহনতী মানুষের শত্রু কংগ্রেসী রাষ্ট্র উচ্ছেদের
লড়াই শেষ হয়ে যায় না

কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত একটা প্রশ্নের জবাব আমরা দিইনি। প্রশ্নটা হ'ল নেহরু যদি প্রকৃত শান্তিবাদী না হন তা' হলে চীন ও সোভিয়েট নেহরুকে এত প্রশংসা করছে কেন? নেহরুজী পিকিং-এ উপস্থিত হ'লে দশলক্ষ নরনারী তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছে এবং পিকিং বেতার কেন্দ্র থেকে নেহরুকে বক্তৃতা করারও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নেহরু সরকার ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষণকারী। কিন্তু তবু তার প্রতি শান্তির শিবিরের এই ব্যবহার কেন এই প্রশ্নের [illegible] বলা করতেই ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা হোমরা-চোমরা মার্কসবাদী (?) ও বিপ্লবী (?) দল আজ একেবারে কুপোকাৎ! R. S. P. প্রমুখ কতকগুলি দল সোজাসুজি বলতে আরম্ভ করেছেন এটা ষ্টালিন পন্থীদের কারসাজি এবং এইভাবে তারা ভারতের পুঁজিবাদকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে এটা মার্কসবাদের পথ থেকে বিচ্যুতি। কিন্তু দুঃখের কথা এসব কথায় আজকাল আর চিঁড়ে ভেজেনা। সোভিয়েট রাশিয়া মার্কসবাদের পথ থেকে বিচ্যুত না, আর, এস, পি, নিজেই বিচ্যুত তা অনেক আগেই প্রমাণ হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে মতামত দিতে (একমাত্র কতকগুলি 'পণ্ডিত' ছাড়া) আজ আর জনসাধারণকে বিশেষ ভাবতে দেখা যায় না। অপর পক্ষে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিরও মতিভ্রম হ'বার জোগাড় হয়েছে। নেতারা এক একদিন, এক একরকম কথা বলছেন। একজনের সঙ্গে আর একজনের কথার মি নেই, আজ বলছেন কাল নিজেই তা' ফিরিয়ে নিচ্ছেন। তবে একটা লেবেল নেহরুর গায়ে পাকা পোক্ত ভাবে মেরে দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছেন—তা হ'ল 'শান্তিবাদী'। যদিও তার জন্যে তাঁদের মাদুরা থিসিসের পরিবর্ত্তন করতে হয়নি, নিজেদের বর্ত্তমান কর্মসূচীকে বাতিল করারও প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু জনসাধারণের এই প্রশ্নের জবাব দিতে তাঁরা এগিয়ে আসেন নি।

আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে চীন ও সোভিয়েটের পক্ষে নেহরু নীতিকে সমর্থন করা এক জিনিষ এবং ভারতের জনসাধারণের পক্ষে তা সমর্থন করা অন্য জিনিষ। তার কারণ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে চীন ও সোভিয়েটের বৈদেশিক নীতির সামনে যে যে সমস্যা, আমাদের দেশের জনসাধারণের মুক্তি আন্দোলনের সামা[illegible] সমস্যা নয়। বিশ্ব পুঁজিবাদকে দুর্বল করা এবং দেশে দেশে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ও জনতার বিপ্লবকে সফল করা এবং সেই উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুদ্ধ চক্রান্তকে বানচাল করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জোটে ভাঙ্গণ ধরাণই চীন ও সোভিয়েটের পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য। এবং সে সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাই আজ তাকে সমাধান করতে হবে। অপর পক্ষে দেশের পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্য মণ্ডিত করে শ্রমিক শ্রেণীর রাজ কায়েম করার এবং তার জন্যই ভারতবর্ষকে যুদ্ধ শিবির থেকে বিচ্ছিন্ন করার সমস্যাই আমাদের দেশের জনসাধারণের প্রথম ও প্রধান সমস্যা। সুতরাং চীন ও সোভিয়েটকে আজ যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে আমাদের হুবহু একই সমস্যা নয়। আবার আমাদের দেশের জনসাধারণের মুক্তি আন্দোলনের সমস্যাই সোভিয়েটের ও চীনের বৈদেশিক নীতির সামনে একমাত্র সমস্যা নয়, কারণ প্রধানতঃ আমাদের দেশের বিপ্লবের দায়িত্ব আমাদের উপরই। কাজেই উদ্দেশ্য এক হলেও, কাজ আলাদা, কর্মক্ষেত্র আলাদা, অতএব কর্মনীতির ও পার্থক্য রয়েছে। তাই সোভিয়েট ও চীনের বৈদেশিক নীতি যা হবে, আমাদের দেশের জনসাধারণের আন্দোলনের নীতির মূলগতঃ পার্থক্য না থাকলেও, হুবহু এক হবে এ ধারনা মারাত্মক ভূল এবং মার্কসবাদের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার লক্ষণ। মনে রাখা দরকার সোভিয়েট বা চীনের রাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের নীতি এক নয়। যদিও ইহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী তবুও একটিই আর একটি একথা ভাবলে ভুল হবে। এভুল যাঁরা করেন তাঁরাই বুঝতে অক্ষম হন কেন চীন বা সোভিয়েট গণরাষ্ট্র ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছার বাণী পাঠায় বা কেন ঐ সব গণরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীরা ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীকে প্রশংসা করেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েট ও চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশকে একত্র ক'রে আজ এক দুনিয়াব্যাপী যুদ্ধ জোট গড়ে তুলতে চায়। কারণ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ একা একা সোভিয়েট, চীন ও সমগ্র দুনিয়ার শান্তিকামী জনগণের সংগে শক্তি পরীক্ষায় নামতে সাহস করেনা। তাই অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশকে নিয়ে সে জোট বাঁধতে চায়। কিন্তু পুঁজিবাদের নিজস্ব অন্তর্বিরোধের জন্য সে আজই সাফল্য লাভ করতে পারছে না। তবু যদি সে সক্ষম হয়, তা হলে যুদ্ধ বাঁধবে এবং সারা দুনিয়া সেই মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। কাজেই সোভিয়েট চীন এবং শান্তি শিবিরের অন্তর্গত প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সামনেই আজ প্রধাণ সমস্যা যে কোন উপায়ে মার্কিন যুদ্ধ-চক্রান্তকে বানচাল করা। কিন্তু দুনিয়ার সমস্ত পুঁজিবাদী দেশকে একত্র করতে চাইলেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজও তাদের একত্র করতে পারেনি, স্বার্থে [illegible] স[illegible] জোট বারবার ভেঙে যাচ্ছে। এখন মার্কিন যুদ্ধ চক্রান্তকে পরাস্ত করতে হলে তার এই যুদ্ধ জোটকেই বানচাল করা দরকার। পুঁজিবাদের স্বার্থ-দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে

সুলেখা কালির কারখানা

সুলেখা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফাউন্টেন-পেন কালি হিসাবে আজ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। নীচের ছবি দুটিতে সুলেখা কালি প্রস্তুত পদ্ধতির অন্তর্গত কয়েকটি জটীল প্রণালী দেখান হইতেছে।

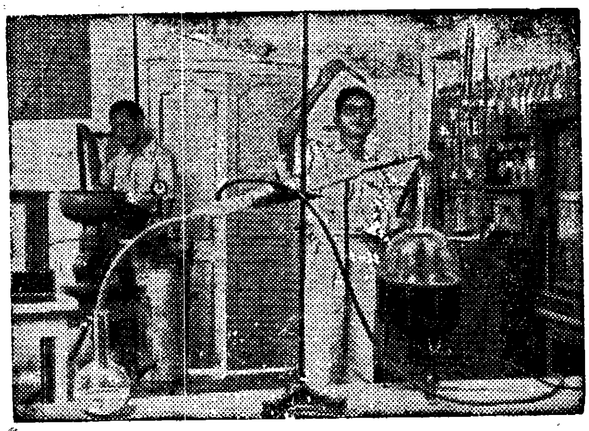

পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ লেবরেটরীর একটি অংশ।

বাঁয়েঃ ভ্যাকুয়াম-চালিত, স্বয়ংক্রিয় ডাবল্-ফিলিং মেশিন।
ডাইনেঃ স্বয়ংক্রিয় ক্যাপ সিলিং মেশিন।

জাতীয় শিল্পের উন্নতি কল্পে প্রকাশিতঃ

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ

কলিকাতা ★ দিল্লী ★ বোম্বাই ★ মাদ্রাজ

নেহরু সরকারের ঝুটা শান্তিনীতির মুখোস খুলুন

শান্তির শিবির আজ এই যুদ্ধজোট গঠনের চক্রান্তকেই প্রথম নষ্ট করে দিতে চায়। কিন্তু কেমন করে তাকে নষ্ট করা সম্ভব? পৃথিবীর প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশের সংগে সোভিয়েট ও চীন যদি আজই প্রত্য[illegible]ব বিরোধিতা করে তা হলে কি মার্[illegible] যুদ্ধজোট দুর্ব্বল হবে? মোটেই নয় বরং ফল উল্টোই হবার সম্ভাবনা। বিভিন্ন পুজিবাদী দেশ যারা আজ নিজেদের পুজির স্বার্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করছে এবং শান্তি শিবিরের সংগে বন্ধুত্ব রাখতে চাইছে তারা তখন প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন পক্ষে ভিড়ে পড়তে বাধ্য হবে এবং পুজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অন্তর্বিরোধ থাকা স্বত্বেও দুনিয়া ব্যাপী সমাজতন্ত্র ও শান্তিবিরোধী শিবির গড়ে তোলার স্বার্থে পুজিবাদীরা শেষপর্যন্ত একত্র হবে। তাতে শান্তির সম্ভাবনা বাড়ছেনা, বিশ্বপুজিবাদের উচ্ছেদের দিন নিকটবর্ত্তী হচ্ছেনা কিংবা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকেও বিন্দুমাত্র অগ্রসর করা সম্ভব হচ্ছেনা তাই এ পথ ভুল পথ। অপরদিকে যদি আজ ছোটখাট পুজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সংগে বন্ধুত্ব রাখা যায় বা অর্থনৈতিক সম্পর্ককে দৃঢ় করা যায় তা হলে পুঁজিবাদী শিবিরের জোটকে দুর্বল করার সম্ভাবনা বাড়ছে, পরিণামে বিশ্ব-পুজিবাদ দুর্বল হচ্ছে। এই অর্থেই সোভিয়েট ও চীন আজ নেহরু সরকারকে ব্যবহার করতে চায়। কাজেই নেহরু সম্পর্কে সোভিয়েট ও চীনের নীতি পুঁজিবাদকে সংরক্ষণের নীতি নয় বরং বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই এক নীতি। আবার বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাদী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের মুক্তি সংগ্রামে এই নীতির প্রয়োগ করলে ভুল করা হবে। সোভিয়েট ও চীনের সাথে সাথে ভারতবর্ষের জনসাধারণ এবং প্রত্যেকটী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মুক্তিকামী জনসাধারণ ও মার্কিন যুদ্ধ চক্রান্তকে বানচাল করতে চায়। কিন্তু ভারতের পুঁজিবাদী শাসক শ্রেনীকে প্রশংসা করে জনসাধারণ এক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার করা সম্ভব নয় কারণ, প্রথমতঃ জনসাধারণের শক্তির উপর নির্ভর ক'রেই ভারতের পুঁজিপতিশ্রেনী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করছে না। ভারতের পুঁজিপতিরা মার্কিন পুঁজির সংগে বন্ধুত্ব বা ঝগড়া যাই করুক, নিজেদের পুঁজির ও সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করেই করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করলেও ভারতের গণ আন্দোলনকে দমন করতে ভারতীয় পুঁজিপতি শাসক শ্রেনীর এতটুকু দুর্বলতা আজও দেখা দেয়নি। সেইজন্যই মার্কিন যুদ্ধ চক্রান্তকে ব্যাহত করতে হ'লে ভারতের জনসাধারনের কর্ত্তব্য ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ জোটের সংগে ভারতের সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে শান্তির শিবিরকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানান। কিন্তু ঐ পথে প্রথম বাধা, ভারতের পুঁজিবাদী শাসন। ভারতের পুঁজিবাদী শাসক শ্রেণীই আজ নিজেদের শ্রেনী স্বার্থ রক্ষার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ শিবিরকে শক্তিশালী করছে। কাজেই ভারতের জনসাধারণের সম্মুখে আজ পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদের প্রস্তুতির জন্যই প্রয়োজন নেহরু সরকারের ঝুটা শান্তি নীতির মুখোস খুলে দিয়ে জনতার সামনে তার আসল চেহারা প্রকাশ করে দেওয়া এবং যুদ্ধজোট থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য শান্তি আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। অপর দিকে, নেহরু সরকারের বৈদেশিক নীতির পিছনে প্রশংসার জয়ঢাক পেটার অর্থ ভারতের দেশী পুঁজিবাদকে এবং পরোক্ষভাবে ঘৃণ্য মার্কিন যুদ্ধ চক্রান্তকেই সমর্থন করা। দুঃখের বিষয়, ভারতের সংগ্রামী জনসাধারণকে এই মারাত্মক বিভ্রান্তির পথে পরিচালনা করার জন্য আজ প্রধানতঃ দায়ী ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি।

নভেম্বর দিবসের বই

মার্কস ও এঙ্গেলস্ঃ

কমিউনিষ্ট ইশ্তেহার (২য় সংস্করণ)	দশ আনা

কার্ল মার্কসঃ

মজুরি দাম মুনাফা	আট আনা

ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস্ঃ

বানর থেকে মানুষের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা	তিন আনা

ভি, আই, লেনিনঃ

কার্ল মার্কসের শিক্ষা (৩য় সংস্করণ)	ছয় আনা
রাষ্ট্র ও বিপ্লব	আড়াই টাকা
গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রাসীর দুই কৌশল	দেড় টাকা
"বামপন্থী কমিউনিজম—শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা	দেড় টাকা

জে, ভি, স্তালিনঃ

সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস (৩য় সংস্করণ)	আড়াই টাকা
সোবিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী	আট আনা
লেনিনবাদের সমস্যা	বার আনা
দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ	ছয় আনা
মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা	পাঁচ সিকা ও এক টাকা
অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিষ্টদের কর্মকৌশল	আট আনা

জি, ম্যালেনকভঃ

উনবিংশ পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্ট	নয় আনা

আরও পড়ুনঃ

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মসূচী	দুই আনা
গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব—অজয় ঘোষ	দুই আনা
শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন—অজয় ঘোষ	তিন আনা
পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ও মার্কিন চক্রান্ত—ভূপেশ গুপ্ত	ছয় আনা

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শাখাঃ ২৬, আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

MARXIST-LENINIST CLASSICS !

	Rs.	As.	P.
Marx Engels :			
On Britain	2	[illegible]	0
Manifesto of the Communist Party ...	0	4	0
Karl Marx :			
Civil War in France	0	4	0
Wages, Price and Profit	0	3	0
Frederick Engels :			
The Origin of the Family, Private Property and State	0	8	0
Socialism : Utopian and Scientific	0	3	0
The Housing Question	0	4	0
V. I. Lenin :			
Marx-Engels-Marxism	1	14	0
Imperialism, The Highest Stage of Capitalism ...	0	6	0
Left-Wing Communism an Infantile Disorder ...	0	4	0
Proletarian Revolution and Renegade Kautsky ...	0	3	0
Immediate Task of the Soviet Government ...	0	2	0
Articles on Tolstoy	0	1	0
Articles (1923)	0	1	0
To the Rural Poor	0	2	0
Economics and Politics in the Era of the Dictatorship of the Proletariat	0	0	6
A letter to an American Worker	0	0	6
Petty Bourgeoisie and Proletarian Socialism ...	0	0	6
J. V Stalin :			
Works, Vol 1—7 each	1	8	0
Vol 8	1	4	0
History of the Communist Party of Soviet Union (Bolsheviks)	1	2	0
On the Great Patriotic War of the Soviet Union ...	0	6	0
Economic Problems of Socialism in the USSR ...	0	4	0
Once more on the Social Democratic Diviation in our Party	0	3	0
Marxism and National Question	0	2	0
Anarchism or Socialism	0	2	0
Marxism and Problems of Linguistics ...	0	2	0
The October Revolution and tactics of Russian Communists	0	2	0
Concerning the Question of the Stratagy and Tactics of the Russian Communists... ...	0	1	0
The October Revolution and the question of the Middle strata	0	0	6
The Proletarian Party and the Proletarian Class ...	0	0	6

NATIONAL BOOK AGENCY LIMITED.

12, Bankim Chatterjee Street,

CALCUTTA-12.

রেজিঃ সি-৩২৫৩

নিয়মিত ★ গণদাবী ★ পড়ুন

বর্গাদারদের বেআইনী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সুন্দরবন চাষী ভাইদের বলিষ্ঠ অভিযান

এস,ইউ,সি ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের ডাকে

দশ সহস্রাধিক চাষী সমাবেশ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

"অমর সুন্দরবনের চাষী, অমর তোমাদের সংগ্রাম! সারাদিনের অবিরাম বৃষ্টিপাত, চূড়ান্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে মাইলের পর মাইল পায়ে হেটে সুদূর গ্রামাঞ্চল হতে যে অভূতপূর্ব জনস্রোত বাঁচার সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে কংগ্রেসী সরকার ও জমিদার-জোতদার গোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ নিষ্পেষণ ও বে-আইনী উচ্ছেদকে প্রতিরোধ করতে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছে—তা ব্যর্থ হতে পারে না। সুন্দরবনের চাষীভাইদের এই মরণপণ সংগ্রাম ভারতের গণআন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে সন্দেহ নেই। আপনারা আমার বৈপ্লবিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।" জয়নগর রক্তা খাঁ প্যাড়ার ময়দানে অনুষ্ঠিত ১৯শে অক্টোবরের বিরাট চাষী সমাবেশে প্রধান বক্তা ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ এই ঘোষণা করেন।

বে-আইনীভাবে বর্গাদার উচ্ছেদ ও ব্যাপক পুলিশী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এস, ইউ, সি ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জিলার আহ্বানে যে চাষী সমাবেশ হয় তাহাতে জয়নগর, মথুরাপুর, মগরাহাট, মন্দিরবাজার, কাকদ্বীপ, কুলপী প্রভৃতি থানার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে বেলা বারোটা থেকে চারটা পর্য্যন্ত একটার পর একটা চাষী মিছিল জয়নগরের এই সভায় সমবেত হয়ে চারিদিক মুখরিত করে তোলে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম বঙ্গ কৃষক ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের সভাপতি সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের নেতা সুবোধ ব্যানার্জী এম, এল, এ।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান বক্তা শিবদাস ঘোষ বলেন যে "আজকের দিনে কে শত্রু এবং কে মিত্র চিনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। ভারতের জনজীবনের সর্ব্বপ্রকার জ্বালাযন্ত্রণা তথা চাষীর এই নিরবিচ্ছিন্ন নিপীড়নের মূল কারণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদের পথেই গণমুক্তি সম্ভব। যে কোন অজুহাতে বা যুক্তির ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে যদি কেউ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার কথা বলে তবে বুঝতে হবে জনস্বার্থের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই—সেও মেহনতী জনতার প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন শত্রু।" লড়াই ছাড়া গত্যন্তর নেই, সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি আহ্বান জানান।

সভাপতি সুবোধ ব্যানার্জী বলেন, "যে আইনকে সুন্দরবনের চাষীভাইরা কংগ্রেসী সরকারকে বাধ্য করেছে রচনা করতে তাকে জমিদার-জোতদার গোষ্ঠি পদদলিত করে চলেছে। আন্দোলনের আঘাতেই আইনী অধিকারকে অর্জন করতে হবে। তিনি ভাগচাষ আইন, জমিদারী উচ্ছেদ আইন প্রভৃতি আইন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। পরিশেষে আন্দোলনের হাতিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর দল সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারকে শক্তিশালী করতে আহ্বান জানান। সভায় উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, বন্দীমুক্তির দাবীতে ও চাষীজীবনের বিভিন্ন সমস্যার ওপর সুচিন্তিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

নয়া চীনের গঠনতন্ত্র

(৪ পাতার পর)

এখানেও সংগ্রাম অবধারিত। তবে, আইন-শৃঙ্খলা ভংগকারী ও সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে বাধাদানকারী ধনী কৃষকদের দৃঢ়ভাবে দমন করা হবে। যাই হোক্, আজকের আমূল পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এদের বিরুদ্ধে গত ভূমি সংস্কারের মত কোন বিশেষ আন্দোলন সুরু করবার দরকার নেই।

অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে: খসড়া গঠনতন্ত্রে একদিকে বলা হয়েছে রাষ্ট্র উৎপাদন ব্যবস্থার পুঁজিবাদী মালিকানা ও অন্যান্য পুঁজি আইনানুযায়ী রক্ষা করবে; অথচ এ কথাও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র পুঁজিবাদী-শিল্প ও বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সম্পন্ন করবে এবং ধাপে ধাপে পুঁজিবাদী মালিকানার জায়গায় সমগ্র জনগণের মালিকানা পত্তন করবে। এই দুটো কি পরস্পর-বিরোধী নয়?

যেটুকু অন্তর্দ্বন্দ্ব এখানে আছে তা আমাদের বাস্তব জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি। আমাদের দেশের এই সন্ধিকালে যে শুধু সমাজতন্ত্রই বিদ্যমান তা নয়, সংগে সংগে পুঁজিবাদও রয়েছে। এই দুই ভিন্ন ধরণের মালিকানার পারস্পরিক সংঘাত হচ্ছে এই সমাজে আজকের দিনে বাস্তবভাবে বিরাজমান একটি সংঘাত। বর্ত্তমান স্তরে, পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যের এমন কয়েকটি ধর্ম্ম আছে যা জাতীয় উন্নতি ও জনজীবনের পক্ষে উপকারী; সেই সংগে তাদের এমন সব ধর্ম আছে যা তার বিপরীত। সংঘাত এইখানেতেই—পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যের অস্তিত্বের মধ্যেই। আমাদের নীতি, যার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা, তা হচ্ছে একদিকে পুঁজিবাদী মালিকানা স্বীকার করে নেওয়া এবং পুঁজিবাদী শিল্প বাণিজ্যের যেসব গুণ জাতীয় উন্নতি ও জনজীবনের পক্ষে অনুকূল, অন্যদিকে যেসব দোষ আছে যা ক্ষতিকর সেগুলোকে দমন করা। পুঁজিবাদী মালিকানা উৎখাত করে সেখানে জনসাধারণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রূপান্তর-কালীন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে খসড়া গঠনতন্ত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে

আমাদের দেশের বর্ত্তমান বাস্তব অবস্থায় আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তোলবার জন্য যে নীতি ও কর্ম্মপ্রণালী গ্রহণ করেছি তা নির্ভুল। একথার সত্যতা আরো প্রমাণিত হয় আমাদের শত্রুদের আর্ত্তনাদ ও বিদেশী পুঁজিবাদী সংবাদপত্র জগতের মন্তব্য থেকে। বিদেশী অনেক পুঁজিবাদী কাগজ মহা ক্ষোভের সংগে আবিষ্কার করেছে যে, আমাদের দেশ যে পথ অবলম্বন করবে এবং যেভাবে খসড়া গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করেছে, তা হচ্ছে "সোভিয়েট ইউনিয়ন অতিক্রান্ত পথই।" সত্যি কথাই ত, আমরা যে পথে চলতে যাচ্ছি সেই পথেই সোভিয়েট ইউনিয়ন এগিয়ে চলে গেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে সংশয়ের বাষ্পমাত্রও নেই। সোভিয়েট ইউনিয়ন যে পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে সেই পথ সারা মানবজাতি একদিন অতিক্রম করবে, সমাজবিকাশের শাসন অনুযায়ী। এই পথকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। আমরা সব সময়েই বিশ্বাস করি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সত্যতা দেশ-নিরপেক্ষ।

সমাজতন্ত্র গঠনের লক্ষ্যকে ব্যর্থ করার জন্য ধূর্ত্ত শত্রুরা এমন অনেক লোককে ভাড়া করেছে—যেমন ট্রট্স্কি-বাদীরা—যারা "বামপন্থী" বলে ভাণ করে কিন্তু আমাদের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের ব্যবস্থা ও কর্ম্মসূচীকে আক্রমণ করে। তারা বলে যে আমরা "একবারে কাজটা শেষ করে ফেলছি না," "আমরা বড় বেশী আপোষ-পন্থী" এবং মার্ক্সবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছি। এইসব আবোলতাবোল বলে তারা জনতাকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। তারা চায়, আমরা যেন এখনই জাতীয় বুর্জোয়াদের সংগে মৈত্রী ছিন্ন ক'রে তাদের যা কিছু আছে সব কেড়ে নেই। তারা আরো অভিযোগ করে, আমাদের কৃষি নীতি "অত্যন্ত ধীরগতি।" তাদের ইচ্ছে আমরা কৃষকদের সংগে আমাদের মৈত্রী বর্জ্জন করি। এসব ধারণা নিতান্তই অর্থহীন নয় কি? তাদের ইচ্ছেমত কাজ যদি আমরা করতাম তাহ'লে সাম্রাজ্যবাদী ও বিশ্বাস ঘাতক চিয়াং-কাইশেক সবচেয়েখুশী হ'ত

চীনা জনসাধারণ শুধু সমাজতন্ত্র গঠনের আদর্শ রচনা করেই ক্ষান্ত হয়নি, সে লক্ষ্যে পৌছবার জন্য কার্যকরী কর্ম্মপন্থাও মেলে ধরেছে। আমাদের শত্রুস্থানীয়দের এতে স্বভাবতই ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, আমাদের শত্রুদের যা ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে সবচেয়েবেশী, চীনা জনগণের কাছে সেটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

ঠিকাদার মজুর ইউনিয়ন গঠন

বিভিন্ন দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আরম্ভ

—ঘাটশীলা (বিহার)

ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন লিমিটেড কোম্পানীতে স্থানীয় ভাবে নিযুক্ত ঠিকাদার মজুরের এক ইউনিয়ন আই, সি, সি, ঠিকাদার মজুর ইউনিয়ন নামে গঠিত হইয়াছে। কমরেড হীরেন সরকার, দুখু মাঝি, অমৃতেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বিষ্টু হেদম ও দুর্গা হেমব্রম যথাক্রমে ইউনিয়ণের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকদ্বয় নির্বাচীত হইয়াছেন। চাকুরীর স্থায়িত্ব, দৈনিক মজুরীর হার বৃদ্ধি, বোনাস, বেতনসহ অসুস্থকালীন ছুটী, প্রিভিলেজ-লীভ প্রভৃতি মৌলিক দাবীর ভিত্তিতে এক স্মারক লিপি, মাসিক ও এসিট্যান্ট লেবার কমিশনারের নিকট দেওয়া হইয়াছে। মাসিক পক্ষ মজুরদের দাবীদাওয়া সম্বন্ধীত কোন ব্যাপারে কর্ণপাত না করায় মাননীয় শ্রম-মন্ত্রীর নিকট আবেদন করা হইয়াছে, মাননীয় মন্ত্রীর নিকট হইতে জবাব না পাওয়ায় গত ২৩শে অক্টোবর ইউনিয়ণের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য ও সাধারণ মজুরদের এক সভায় ধর্ম্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগামী ৫ই নভেম্বর হইতে ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিবার নোটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য একটি 'ষ্টাইক কমিটি' গঠিত হইয়াছে এবং কারখানা ও গ্রামে প্রচার চালান টাকা পয়সা সংগ্রহ, ভলাণ্টিয়ার্স সংগ্রহ প্রভৃতি কাজের কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। ঠিকাদার মজুরদের ধর্ম্মঘটে সহযোগিতা করিবার জন্য মূল আই, সি, সি, কোম্পানীর কারখানার মজুরদের নিকট আবেদন করা হইয়াছে।